# সুবর্ণরেখার মানুষ

বরুণ মাইতি


ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

দে বুক স্টোর

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০৭৩

SUBARNAREKHAR MANOOS
Collection of Bengali Short Stories by
BARUN MAITI

॥ প্রথম প্রকাশ ॥
১৫ই মাঘ ১৩৭০

॥ প্রকাশক ।
ঈশ্বর দত্ত   ১১, চিন্তামণি দাস লেন   কলকাতা ৭০০০০৯

॥ প্রচ্ছদ শিল্পী ॥
পঙ্কজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ছেপেছেন ॥
গীতা প্রিন্টার্স   ২১, পঞ্চানন ঘোষ লেন   কলকাতা ৭০০০০৯

॥ উৎসর্গ ॥

যাঁর হাত ধরে
সাহিত্য জগতে আমার প্রথম পদক্ষেপ
সেই অমল মানুষ
**শ্রী রামেশ্বর পাণিগ্রাহী মহাশয়কে**

## গল্পক্রম

# সুবর্ণরেখার মানুষ

রাখালের যখন ঘুম ভাঙে তখন সবে একটি দু'টি করে মোরগ ডাকাডাকি শুরু করেছে। গরুকে জাবনা দিয়ে, নিজের ভোরের কাজটুকু সেরে সকাল সকাল লাঙল নিয়ে মাঠে যেতে হলে তখুনি উঠে পড়তে হয়। কিন্তু ভালো করে কানখাড়া করে সে শুনতে পেয়েছিল আকাশ টিপটিপিয়ে ঝরছে। বাতাস বইছে। দমকা হাওয়ায় থেকে থেকে সোঁ সোঁ শব্দ। একটানা নয়, একটু যেন দম নিয়ে নিয়ে। এই বাদলায় এত ভোরে লাঙল নিয়ে বেরুনো যায় না। অগত্যা বিছানায় এদিক ওদিক করা। ভাল না লাগেতো নিদেন একছিলিম তামাক ধরিয়ে খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। আর এই ভাবে সময় কাটিয়েও যখন বৃষ্টি থামার কোন আভাষ পাওয়া যায় না, অথচ চারদিক বেশ ফরসা হয়ে আসে, তখন আর রাখাল হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেনি। বসে থাকেই বা কি করে। প্রথম প্রথম কাজ শেষ করতে পারলে তবে তো মা লক্ষ্মী দু'মুঠো ঘরে আসবেন। না, রাখাল এই বৃষ্টি-বাদলা গ্রাহ্য করেনি।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার না এলেই বোধ হয় ভালো হত। বাতাসের বেগ আরও বাড়ছে। শিস্ দেওয়ার মত শব্দ। একটু কমতে না কমতেই আবার বৃষ্টির দমক। মাথালি মানে না বৃষ্টির ছাঁট। পাঁজরে গিয়ে যেন ঠ্যাকে। বৈঁচি কাঁটার মত ফোটে। কাপড় চোপড় ভিজে একশা। হাতের চেটো কুঁচকে গেছে। সাদা, রক্ত নেই যেন। লাঙলের বোঁটা আলগা হয়ে আসে হাতের মধ্যে।

কাঁপুনি ধরে সারা শরীরে। রাখাল বুঝতে পারে এ নির্ঘাৎ নদী বাড়ার যোগ। সুবর্ণরেখার যৌবন আসার ইঙ্গিত। এ বৃষ্টি এখন আর থামবে না। নিজের কষ্ট, অবলা জীব দু'টির কষ্ট। আর কাজ ও ঠিক মত করা যাচ্ছে না। লাঙল বন্ধ রাখার পক্ষেই রাখালের মন সায় দিতে চায়।

এমনিতেই আজ মাঠে লাঙল কম। তাও কমতে কমতে এখন নেই বললেই চলে। রাখাল পাশের জমির রঘুকে হাঁক দেয় 'কি রঘু, ঘর যাবু নাকি ?

মুই পালিলি। বড় থরায়টে।' রঘু সাড়া দেয়। লাঙ্গল থামিয়ে এগিয়ে আসে রাখালের কাছে। ট্যাঁকের কৌটো থেকে বিড়ি বার করে। হাতের চেটোর আড়ে ম্যাচিস জ্বালায় রাখাল। দু'জনেই বিড়ির গরম ধোঁয়ায় বুকের ভেতরটাকে একটু তাতিয়ে নেয়। প্রকৃতি আলাপন শুরু করে। কথার পিঠে কথা। কথার কি শেষ আছে। মানুষের রোমে রোমে লুকিয়ে রয়েছে কথার ঝাঁপি। তা সে খরার কথা, কি বর্ষার কথা—কত অতীত পলির মত জমে আছে চল্লিশ ছাড়িয়ে যাওয়া মানুষগুলির বুকে। তা সে এমনি ধারা বাদলা ঝরা, আকাশ কাঁপানো দিন হলোই বা, কি আসে যায় তাতে। বিড়ির সুখটানের মৌতাতে সবই জমে। আবার এক সময় তা টুটে ও যায়। তখন ঘর পালাবার তাড়া। 'কিষ্টের জীব'-কে কষ্ট দিতে প্রাণ টাটায়।

ঘরের দিকে চলতে চলতে ও রাখালের মনে যেন টান পড়ে। আটকায় কোন কিছুতে। বুকের ভেতর খোঁচা। নদী যদি বেশি বাড়ে। সবে ক্ষীর জমতে শুরু করেছে ধানে। নদী লাগোয়া তার আউশের জমি দুবিধা। কী ফলন-টাই না এ বছর হয়েছে। মন কুড়ি তো হবেই। আসছে টানের মাসগুলোর খোরাকী, বড় ছেলে পরশুরামের বোর্ডিং এর জন্য টাকা, পুজোর খরচ, আমন চাষের খরচ—এমনি সব হাজার খরচের ফিরিস্তির স্বপ্ন ঐ জমি। মন কি তার সাধে উতলা। রাখাল রঘুর হাতে গরু দুটোকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নদী ফেরতা হয়ে যাওয়াই মনস্থ করে।

ধীরে ধীরে যত এগোয় ততই নদীর গর্জন স্পষ্ট হয়। ক্ষ্যাপা হাতীর মত গর্জন। লাল ঘোলা জলে ঢেউ এর মাতন—কল্ কল্, ছল্ ছল্। সেদিনের হাড় জিরজিরে নদীর আজ বিশ পঁচিশের নারীর ঢলঢলে শরীর। জলের টানই বা কি। পাথরের চাঙড়ও তার টানে খোলাম কুচি। ওপারে এখন দৃষ্টিও পেঁছায় না। এত বিস্তার। পাড়ের উপর ঢেউ এর আছাড়—ছলাৎ ছলাৎ। পাড় ভাঙ্গে। তারও শব্দ ওঠে—ঝুরু ঝুরু। সেই জন্ম থেকে চেনা সুবর্ণরেখাকেও আজ আবার নূতনরূপে দেখে রাখাল। ওর অঙ্গে অঙ্গে রূপের বাহার। সে রূপ প্রাণকে কখনো বা দগ্ধায়, কখনো বা মুগ্ধায়। রাখাল দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেয় সুবর্ণরেখার গভীরে। আর তখনই ওর সারা শরীর জুড়ে এক বিষের স্রোত বয়ে যায়। ওর দাগা পাওয়া বুকেও রক্তের উথালি পাথালি। পাঁজরে আঘাত লাগে—কড় কড়। সে স্পষ্ট দেখতে পায় সর্বনাশী সুবর্ণরেখা পুবের পাড় ঘেঁষে

তার মাটি খাগী লক্‌লকে জিভটাকে মেলে ধরেছে। স্রোতের টান এই পাড় ঘেঁষেই বেশী। গত কয়েক বছর স্রোত ছিল পশ্চিম ঘেঁষে। মাকুড়িয়া গ্রামটাকে চেটেপুটে প্রায় শেষ করে দিয়েছে। এবছর আবার পুবে ঘুরল। বেলামুলা, নৈকুল বেঁচা, বাঘড়া—এবার এদের পালা। রাখাল হঠাৎ দেখতে পায় তার পায়ের কাছ থেকে বেশ বড় একটা ফাটল ক্রমশ হাঁ হয়ে আসছে। সে লাফিয়ে পেরিয়ে আসে এদিকে। আর দেখতে দেখতেই কয়েক লহমার মধ্যে কাঠা খানেক পাড় হুড়মুড় করে নদীর পেটে ঢুকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাখালের বুকের পাড়টাও ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়। বুকের উপর পড়তে থাকে হাতুড়ির ঘা। তার জমিটাও যে নদী লাগোয়াই। মাত্র তো বিঘা পাঁচ দূরে পাড় থেকে। জলের ছাট সারা শরীরে বাজে। পাঁজর ফুটিয়ে বুকের ভেতরও। সোনালী মাথাওয়ালা আউশের ডগা। কাঁধির ভারে নুইয়ে পড়েছে। নতুন বৌ-এর লাজে রাঙা মুখ যেন। অজানা আশঙ্কায় সারা শরীর জুড়ে কাঁপুনি। হয়ত পুলক শিহরণইবা। রাখাল এসব ভাবতে পারত অন্য সময় হলে। এখন রাক্ষসী সুবর্ণরেখা তার মনে কেবলই কু গেয়ে যায়। ধানসহ জমিটুকু ওর গহ্বরেই কি হারিয়ে যাবে। সে আর নড়তে পারে না। কে যেন শিকল দিয়ে বেঁধে দিয়েছে ওর শরীরকে এই মাটির সাথে। উবু হয়ে বসে জড়িয়ে ধরে একগোছা ধানকে বুকের সাথে। ক্ষীরভরা ধানের শীষগুলো তার চওড়া লোমশ বুক থেকে টেনে নেয় পিতৃত্বের ওম। রাখালের চোখের ভেতর ক্রমশ উষ্ণতা বাড়ে। ঝাপসা চোখে সে চেয়ে থাকে জমিটার দিকে—ধানের গাছ আর ধানের দিকে। প্রতিটি মাটির কণাইতো তার বুকের সাথে এক সুরে বাঁধা। অথচ সেই মাটিই কিনা……।

মাস দুয়েক আগেও ঘোষকর্তা কুকুরের দৃষ্টি নিয়ে উসখুস করছে জমিটার জন্য। এ তল্লাটে প্রায় সব জমিই তো ওর। শুধু ও মাথায় নকুলের তিন বিঘা, পাড় লাগোয়া রহমতের এক বিঘা। আর তার এই দু বিঘা এখনও ওর পেটে ঢোকেনি। আর এই জন্যই তার যত ছটপটানি। ব্যাটার মাথায় যত কুবিদ্ধি ক্রিমিকিটের মত কিলবিল করে বেড়াচ্ছে দিন-রাত। সেদিন বলে কিনা, 'হ্যাঁরে রাখাল, তোর মেয়ের বিয়েটা নাকি টাকার জন্য ভেঙ্গে গেল। তা আমাকে বললি না কেন? আমরা কি গ্রামে বাস করি না? আজকালকার বিয়ে কি আর বিনে পয়সায় হয়। হাজার দুয়েক পণ তো সবাই চাইবেই। আবার পাত্রটা নাকি চাকুরিয়া শুনলাম। এমন পাত্র হাতছাড়া করতে আছে? টাকা না হয়

এখন আমিই দিতাম। তারপর কাজ শেষ হলে দু' এক বিঘা জমিটমি ছেড়ে দিতিস ন্যায্য দামে। আরে, জমি বড় না মেয়ে ?'

রাখাল বুঝতে পেরেগেছিল ঘোষ কর্তার আসল মতলব। ওর মত লোক তার মেয়ের খোঁজ নিতে আসবে ? সে প্রথমে বেশ অবাক হয়ে গেছিল। আসলে ওর দরদ তো 'মড়ার জন্য শকুনের'। জমির চেয়ে মেয়ে বড় হতে পারে, তবু জমি বেচতে বুকটা টাটায় যে। নিজের কলজেটুকু উপড়ে দিতে পারে কেউ ? তাছাড়া যে লোক মেয়ের চেয়ে টাকাই পছন্দ করে বেশী, তার ঘরে মেয়ে দিবে কি করে। ওই ঘোষবাবুদের দেখাদেখি তাদের মত গরীব চাষাদের ঘরেও আজ পণের বিষ ঢুকেছে। পণ দিয়ে মেয়ে বিয়ে দিতে কিছুতেই সায় দেয় নি তার মন। থাক বরং মেয়ে কুমারী হয়ে। তবু টাকা দিয়ে বর কেনা, এ তার কাছে বিষ। সে রাগে ফুঁসে উঠেছিল। ঘোষকর্তার মাড়িয়ে যাওয়া পথের উপর ছিটিয়েছিল থুথু। বিড় বিড় করে মনের ঝাল মিটিয়েছিল। দাঁতের উপর দাঁত, হাতের চেটোর উপর আঙুল চেপে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ।

আজ ভাবে সেদিন ঘোষকর্তার কথামত জমিটাকে বেচে দিলেই হতো। মেয়ের বিয়েটাতো হতো। এমনি করে রাক্ষুসীর পেটে ঢেলে দিতে হত না। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা টান। রক্তের ভেতর পর্যন্ত শেকড় চালানো এক মস্ত গাছ সারা বুক জুড়ে। তাকে উপড়ে ফেলে দেয় কি করে। তাহলে নিজের মরনই যে হয়। না. আজকের আশঙ্কা সেদিন মনে এলেও সে জমিটাকে বেচে দিতে পারত না। রাখালের ইচ্ছে হয় এই মাটি, এই ধান আর এই বৃষ্টির মধ্যে সে মিলেমিশে গানের সুর হয়ে যায়। সেই সুর না হয় নদীর জলের সাথেই মিশে যাবে। জমির সাথে তাকেও নিয়ে সুবর্ণরেখার জ্বলন্ত ক্ষিদে মিটুক। সে এমনি বর্ষায়, এমনি এক দুর্যোগের দিনে থকথকে কাদা, জল আর সোনালী ধানের উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

বুকের উপর তুলে নিল বৃষ্টির ছাট। আর বুকের গভীরে টেনে নিল ভেজা-মাটি এবং ধানের সেই প্রিয় সুবাস। তার চোখের ভেতর তখন আর এক নদী—উষ্ণ জল বয়ে বয়ে কোথায় হারিয়ে যায়। রাখাল কিছুই আর ভাবতে পারে না। শুধু শুয়ে থাকে মড়ার মত।

দুপুর পার করে অন্য এক রাখাল হয়ে সে ঘরে ফিরল। তখনও গরু গুলোকে খেতে দেওয়া হয়নি দেখে ফুঁসে ওঠে প্রচন্ড উত্তাপে। মেজছেলে

হরেরামকে হিড়্ হিড় করে ঘর থেকে টেনে এনে তার সারা শরীরে ঢেলে দেয় বুকের আগুন। তার বউ পূর্ণিমা ও মেয়ে জবাকে পর্যন্ত খেঁকিয়ে ওঠে কুকুরের মত। তবু বুকের মধ্যে উত্তাপ—কেবলই পোড়ানি। ভাত খেতে বসে। গলা পেরোয় না ভাতের ঢেলা। পেটের ভেতর থেকে যেন ফেরৎ পাঠায় সব। ঘটি থেকে আলগোছে ঢক্‌ঢক করে জল খায় কিছুটা। ভাতের থালা ছেড়ে ওঠার উদ্যোগ করতেই পূর্ণিমা আর চাট্টি খাওয়ার অনুরোধ করে, আর একটু তরকারী দিতে চায়। রাখাল আর কিছু না বলেই শুধু চোখের আঁচের আগুন-টুকু তার উপর ছড়িয়ে দিয়ে উঠে যায় হাত ধুতে। জবা কল্কেটা ধরিয়ে নিয়ে আসে। রাখাল হুঁকোতে টানও দেয় কয়েকটা। তামাক যেন বিস্বাদ লাগে। সরিয়ে রাখে দূরে। একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে ও দেখে ছাড়ান নেই। শরীরময় যন্ত্রণা। বুকের ভেতর থেকে কি যেন একটা ঠেলে আসতে চায়। এপাশ-ওপাশ করে শুধু, ঘুম আসে না। চোখের ভেতর সেই এক ছবি। কিছুতেই বিছানায় নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। কেঁদে কেঁদে ডাক দেয় কে যেন। তাকে ভুলবে কি করে!

রাখাল ঘরের কোন থেকে তার লাঠিটা বের করে। এগিয়ে চলে নদীর দিকে। তার প্রিয় জমিটার দিকে। নদী উপচে পাড়ের ওপর উঠে এসেছে জল। রহমতের জমির পূব-উত্তর কোনায় যে খেজুর গাছটা ছিল তার কোন চিহ্নই নেই। ধান গাছগুলো গলা জলে দাঁড়িয়ে ভীরু চাউনিতে করুন আকুতি জানাচ্ছে। রাক্ষসী সুবর্ণরেখার মাতন আরো বেড়েছে। আরও তীব্র গর্জন। ঢেউ-এর সাথে রাখালের দেহের রক্তও কাঁপে—ছলাৎ-ছলাৎ। সে দেখে নদীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রহমৎ। ওর ধনুকের মত বেঁকে যাওয়া শরীরটা যেন বহু কষ্টে দু'টি পায়ের উপর ধরা। রাখাল এগিয়ে যায় তার দিকে। কাঁধের ওপর হাত রাখে। চমকে ঘুরে তাকায় রহমৎ। আর তখনই রাখাল দেখে ওর গাল বেয়ে বৃষ্টির জলের সাথে গড়িয়ে চলেছে অন্য একটি জলের ধারা। দু'জনেই কথা হারিয়ে ফেলে। নীরবেই এ-ওকে ছুঁয়ে যেতে থাকে। নদীর জল ক্রমশই ফুলে ওঠে। হাঁটু ছাড়িয়ে আরও উপরের দিকে। আঁধার ঘনায় বাইরে এবং ওদের মনের ভেতরেও।

রাখাল রহমতের কাঁধে চাপ দেয়। ভাংগা গলায় ডাকে 'রহমৎ ভাই'। রহমৎ অনেক কষ্টে তার মাথাটাকে ধড়ের উপর ধরে রাখতে পেরেছে তেমনি এক ভঙ্গিতে

চায় তার দিকে। রাখাল সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে তাকে। 'কি করবু ভাই এযে পর্‌কিতির মার। রাক্ষসীর খিয়াল যখন চাপ্‌চে, কিছু রইভোনি এতল্লাটে।' রহমৎ হঠাৎ বাচ্চা ছেলের মত ড্‌করে ওঠে। 'আর যে কিছু রইলানিরে আমার। অমন সনার মত জমি, তাও গেলা। ঘরে আট-নটা পেট। এর চাইনু আমার মরাবি ঢের ভালা থাইলা।' রহমতের কথা তার কান্নার সাথে মিশে যায়। রাখালও আর নিজেকে রহমতের থেকে আলাদা করে রাখতে পারে না। ইচ্ছে করে রহমতের সব দুঃখগুলোকে নিজের বুকে তুলে নিতে। কিন্তু কিছুই করতে পারে না। শুধু বুকের ভেতর জমতে থাকে তীব্র অভিমান। গরীবকে যে আরো গরীব করতে চায়, তাতেই যার আনন্দ, তাকে সে কেন মা বলে ভাববে? তার এতদিনের বিশ্বাসটা গলে যায় অভিমানের তাপে। আর এই তাপই জাগিয়ে তোলে তার পৌরুষকে। ক্রমশ কঠিন হয় তার মন। এক প্রতিজ্ঞায় নিজেকে বাঁধে। অনেক দূর থেকে যেন সে রহমতকে বলে, 'নারে, বাঁচতে মোর মেন্‌কাকে হবেই, মরতে যাবা কুন্‌ দুখ্যে।' রাখালের গলার স্বরের দৃঢ়তা স্পর্শ করে রহমতকে। একটা জড়িয়ে ধরার মতো কিছু যেন পায় সে রাখালের মধ্যে। তার দাড়ি কাঁপিয়ে ঝরে দীর্ঘশ্বাস। বলে 'চ রাখাল, সাঁঝ হিলা, ঘর চল।'

রাখাল আগুনে পোড়া ইস্পাত হয়ে মাঠ থেকে ফেরে। বউ-এর পাথরের শরীর আর মাঘী চাউনির ভেতর ঢোকে ঘরে। দেখে, বাইরের প্রকৃতির গর্জন, উন্মত্ততা আর হিংস্রতা তার ঘরের ভেতরটাকে বড় বেশী শান্ত, নীরব আর শীতল করে দিয়েছে। রাখাল দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ বৃথাই লুকোবার চেষ্টা করে। আর তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে নিজেকে ছুঁড়ে দেয় দূরে। বউ-এর দিকে তাকিয়ে বহু ব্যবহৃত অথচ প্রিয় কথাটাই বলে, 'কি গো পূর্ণিমার চাঁদে যে আজ হঠাৎ গ্রহণ লাগচে।' পূর্ণিমা কেঁপে ওঠে, সন্ধানী দৃষ্টি মেলে ধরে তার উপর। খুব বেশী চেনা মানুষটাকে ও তখন যেন অচেনা ঠ্যাকে। চেয়েই থাকে সে।

'আরে, বসি রইচ ক্যানে সব। বর্ষা-ঝড়িয়ায় কুন্‌ঠি জুত করিকি খাওয়া দাওয়া হবে—খেচোড় নাহিলা লাড়িয়া দিকি চাউল ভাজা। তা নাই, সব চুপচাপ।'

'লদি কি ছাড়ি যায়টে।'

'মাথা খারাপ। পাগলা হাতীর মত গর্জায়টে, লদি ছাড়বে অখুনি!'

'তবে ?'

'তবে কি ? ও হো—' রাখাল হেসে ওঠে। অন্ততঃ তারই চেষ্টা করে। 'আরে তাঁহে কি হিচে। সউ জন্যইতো আর বেশী কি ভালা ভালা খাইতে হবে। আজ মরি গ্যালে কাল দু'দিন। অত বেশী নাই ভাবিকি আজকার দিনটা টিকে হাসি খেলিকি কাটিই দিয়া যাউ।'

রাখাল বউ-এর দিকে সরে আসে। গলা নাবিয়ে আনে। 'বুঝলু, লদির গতিক্ সুবিধার না, বেশী কি ভুজা-টুজা ভাজি রাখ। কখন কি হবে বলা যায় নি। লে উঠ্ জল্দি।'

'হুঁ গো জমিটা আছে ?'

'যাইনি বা অখনঅ। তবে বেশীক্ষণ না।'

দু'জনেই দু'জনের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়। কি এক শূন্যতায় ডুবে থাকে। হারায় কথা। নিঃশব্দতাই বড় বেশী সরব হয়ে ঝরতে থাকে। মনের মধ্যে বাজে মন। সুরে সুর। কিন্তু বেশীক্ষণ এ অবস্থা থাকে না। আবার ঘরের ভেতরের চেহারা পাল্টায়। রাখাল ছেলে মেয়ে গুলোকে মাতিয়ে তোলে এটা ওটা বলে। পূর্ণিমাও যেন সব কিছু ভুলে থাকার শক্তি পায়। যেন সবাই এক উৎসবে মেতে ওঠে—হারানোর উৎসব। বৈরাগী হওয়ার আনন্দ। পূর্ণিমা চাল ভাজে, তাতে ছোলা ভেজে মেশায়। রাখাল রাস্তার বারোয়ারী কল থেকে দু' কলসী জল তুলে আনে। জবা হ্যারিকেন নিয়ে বাবাকে পথ দেখায়। তারপর সবাই খেতে বসে, নারকেল আর চালের ভাজা। রাখাল খেতে বসে ছেলে-মেয়েদের মজার মজার গল্প শোনায়। আর দেখে কচি মুখ গুলোর সাথে খুশীর ঝিলিক খেলে যায় আরো একটি বয়স্ক মুখে। এক সময় বাচ্চাগুলো কুন্ডলী পাকায় এখানে ওখানে। রাখাল আর পূর্ণিমা বুকের ভেতরে গরম বাতাস ধরে রেখে তখনো জেগে থাকে। কাজ করে যন্ত্রের মতো। পূর্ণিমা মুড়ী ভাজে—বন্যার রসদ। রাখাল ঢোকে গোয়ালে। এই রাতে ও আবার জোর করে জাবনা খাওয়ায় গরুগুলোকে। তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে। কে জানে এইটাই তাদের শেষ খাওয়ানো কি না। বিড় বিড় করে তাদের সাথে কথা বলে। এতক্ষণ বুকের ভেতর আটকে রাখা মনের ভাষা। ঘরের মানুষকে শোনাতে না পারলেও গরুগুলোকে শোনাতে কোন বাধা অনুভব করে না। হয়তো তা নিজেকেই শোনায়। কিছু খড় এনে গোয়ালের দাওয়াটায় জড় করে রাখে। চলে আসতে

গিয়েও আবার কি ভেবে দু' আঁটি খড় এনে গরুলোর মুখের কাছে দেয়। রাস্তার দিকে একটু এগোয়। দেখে, গ্রামের ভেতর জল ঢুকছে। সারা গ্রামটা এই রাতে আবার জেগে উঠেছে যেন। ওপাড়ার বাগদীরা কয়েক ঘর টুকিটাকি জিনিস পত্র নিয়ে সময় থাকতে থাকতে ঘোষবাবুদের দালান ঘরে আশ্রয় নিতে চলে যাচ্ছে। রাখালের কাকা ও বেড়ার ওপাশ থেকে হুপিং কাশির তোড় চাপতে চাপতে এসব দেখে। আর কাশি থামলে রাখালকে জিজ্ঞেস করে, 'অখন্ কি করবু ভাবুটু রাখাল ?'

'তুমি কি করব ?'

'লদীর যা অবস্থা, সরি পড়াই ভালা।'

রাখাল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কি যেন ভাবে। তারপর বাতাস কাঁপিয়ে শ্বাস ফেলে। বলে, 'না খুড়া, এ মাটি ছাড়িকি কাঁহি যাবানি আমি। তুমি বরং চালি যাও।'

রাখাল তার কাকারও দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শোনে। তারপর কাসির একটানা শব্দ। সে আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে না, ঘরে ঢোকে। জবা ঢুলছিল। তাকে ঠেলে তুলে। দু'জনে ধরাধরি করে একটা খাটের ওপর আর একটা রাখে। তার উপর ঘরের মোটামুটি দামী জিনিসপত্রগুলো এনে জড়ো করে। মাঝে মাঝে চোখ চারায় খাটের ওপর, আর ঘরের অন্যান্য জিনিসগুলোর দিকে। কখনো খাট থেকে এটা নামিয়ে ওটা তোলে। কখনো আবার ওটা নামিয়ে এটা। একসময় নিজে আর কিছু ঠিক করতে না পেরে পূর্ণিমাকে ডাকে। জবাকে মুড়ি ভাজতে বসিয়ে পূর্ণিমা উঠে আসে। কিছুক্ষণ জিনিসগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর কিছু না বলে খাটের জিনিসগুলো ঠেলেঠুলে একটু জায়গা করে। ঘরের কোনে রাখা লক্ষ্মীর পটটা তুলে এনে বসিয়ে দেয় সেখানে। রাখাল লক্ষ্য করে পূর্ণিমাকে। কিছু বলে না, নীরবে একটা হাসির রেখা তার মুখে লেগে থাকে।

হ্যারিকিন নিয়ে রাখাল বেরিয়ে আসে বাইরে। জল আরও ফুলেছে। দাওয়ার কাছ থেকে আর মাত্র হাত পাঁচেক নীচে। তার কাকারা সবাই ঘর ছাড়ছে। তাকেও তারা যেতে বলে। রাখাল তবু নিজেকে খাড়া রাখে। কোন শক্তি যেন তাকে ভাঙতে পারবে না। এমনি এক জোর খুঁজে পায়। জমিই যদি না থাকে তবে বেঁচে থেকে কি লাভ। মরতে হয় মরবে। মৃত্যু জয়ের

মন্ত্র বাজে কানে। বাজে নয়, বরং বুকের ভেতরে ধরা আছে যেন। গরুগুলোর জন্যই কষ্ট হয় তার বেশী। গোয়ালে ঢুকে দেখে সবগুলোই কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। খড় পর্যন্ত খায়নি। তাড়াতাড়ি গলার দড়ি খুলে দেয় সে। গায়ে হাত বুলিয়ে বলে, 'যাবুতো যা, যেমুহা খুশী। নিজের মরণ-বাঁচন অখন নিজের ম্যানে দ্যাখ।' গোয়ালের কপাট খোলাই রাখে। তবু গরুগুলো কোথাও যায় না। শুধু তার মুখের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে। রাখাল আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না ওদের ভীত দৃষ্টির সামনে। তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসে। ঘরে ঢুকে পূর্ণিমাকে তার কাকাদের ঘর ছাড়ার খবর জানায়। পূর্ণিমা বিচলিত হয় কিছুটা। 'অখন কি করব?' জিজ্ঞাসা করে রাখালকে। রাখাল বউ এর চোখে চোখ রাখে। 'এ ভিটা ছাড়িকি কাঁহ্ যাবা নি ভাবিটি। মরলে মরবা, বাঁচলে বাঁচবা। তুই বরং ছুয়াপুয়াগুলাকে লিকি ঘোষবাবুর ঘরকে চালি যা।' পূর্ণিমা কিছু বলে না, তেমনি বসে থাকে। 'কি রে যাবু? তাহিলে চ' ছাড়ি দিসি।' রাখালের প্রশ্নে পূর্ণিমা মুখ তোলে। ঠোঁঠের ওপর দাঁত চেপে নিজেকে সামলায়, 'আমাকে অত স্বার্থপর ভাবল কি করি কি? মরলে দু'জনে মরবা। বাঁচলে বি দু'জনে।' তারপর হাঁটু দু'টোর ফাঁকে নিজের মুখটাকে গুঁজে দিয়ে নিজেকে লুকোতে চেষ্টা করে। রাখাল চেয়ে থাকে ওর দিকে। বলে, 'তাহিলে চল্ জিনিসপত্রগুলা চালের উপর উঠিই লেই। জল উঠতে আর বেশী দেরী নাই।'

ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় দু'জনে মিলে চালের ওপর তোলে—মুড়ির টিন, জলের কলসী, কিছু শুকনো কাপড়, কয়েকটা বস্তা, ছাতা, দু-একটা থালা, গ্লাস ইত্যাদি কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস পত্র। দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে চালে। এদিকে জল ক্রমশ বেড়েই চলে। দাওয়া থেকে চার হাত, দু'হাত, এক হাত দূরে হতে হতে দাওয়ায় জল ওঠে। ছেড়ে দেওয়া সত্ত্বেও কোথাও যায়নি দেখে গরু-গুলোতে ওই ঘরে এনে তোলে। তবু অন্ততঃ কিছুটা তো উঁচু এ ঘরটা। নিজেরা সিঁড়ি বেয়ে ওঠে চালের ওপর। কোলের বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে ভয় পেয়ে। তাকে বুকে চেপে সামলাতে থাকে পূর্ণিমা। সেজোটাকে রাখাল নিজে, আর জবা ও হরেরাম দু'জনে দু'জনকে ধরে ভয়ে ভয়ে বসে থাকে বাবার দিকে চেয়ে। রাখাল সাবধান করে দেয় সবাইকে। আঁধার ভেদ করে চার-দিকের থৈ থৈ করা জল পর্যন্ত দৃষ্টি চলে যায়। শুধু জলের কলু কলু

রব। মাঝে মাঝে দূরে থেকে মানুষের ক্ষীণ গলা ভেসে আসে। রাখালেরা জেগে রয় মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা. নিয়ে। তবু মন্দের ভালো বৃষ্টিটা এখন নেই। আকাশে দু' একটা তারার অনেক কষ্টে শুলুক মেলে। মাঝ রাত গড়িয়ে গেছে বলেই রাখালের মনে হয়। হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে বাছুরটার 'হাম্বা-হাম্বা' চীৎকার আর গাইটার ফোঁস ফোঁস শব্দ ভেসে আসে। রাখাল বুকের ভেতর অবিরাম বল্লমের খোঁচা বোধ করে। সামনে দৃষ্টি মেলতেই দেখে পূর্ণিমার দৃষ্টিও তারই উপর। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হয় তার। এই বন্যার মধ্যে আটকে পড়া—এতো তারই জন্যে। সে কি ভুল করেছে। ঘর-বাড়ী, জমি-জিরেত —এসব হারিয়ে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ! জীবন মানেই কি শুধু জানে বেঁচে থাকা? চিন্তাগুলো জট পাকায় রাখালের মাথায়। জটিল থেকে ক্রমশ জটিলতরতে। হয়তো বা ভয় থেকে নির্ভয়তায়। কিংবা গভীরতর শঙ্কায় দোলে সে। আলো-ছায়া খেলে যায় বুকে। আর সেই বুক কাঁপিয়ে রক্ত উছলায় হঠাৎ! তার কাকাদের রান্নাঘরের দেওয়াল হুড়মুড়িয়ে ধ্বসে পড়ে। যতটা সম্ভব নিজেকে সামলে আর সবাইকে সান্ত্বনা দেয় সে। তবু যেন গলা কেঁপে যায়। তার বুকটা কি এই মুহূর্তে অনেক অনেক চওড়া হতে পারে না, যাতে সে সবাইকে তার বুকের ওপর চেপে রেখে নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারে! তার বউ-ছেলে-মেয়ে মায় গরুগুলো পর্যন্ত তাদের বুকের ভেতরের আটকে রাখা বাতাসকে নির্ভয়ে ফেলতে পারে। রাখাল এমনি সব হিজিবিজি চিন্তায় যখন ব্যস্ত তখন পূর্ণিমার হেমন্তের শিশিরের মতো গলার স্বর শুনতে পায়। 'হুঁ গো, দাঁতুনে বনিয়ার জল ঢুকে?' রাখাল চমকে দৃষ্টি ফেরায় পূর্ণিমার ওপর। চেয়ে থাকে। সেই অন্ধকারের বউ-এর চোখের মণি দু'টির ভাষা পড়ার চেষ্টা করে। বুঝতে পারে ও চোখ এখন পাড়ি দিয়েছে সুদূরে—আত্মার আত্মীয়ের কাছে। আমি নই, তুমি নও—বুকের মানিক যে! থাক না চার চারটে আত্মজ কাছে। সে যে দৃষ্টির আড়ালে। রাখাল বুঝতে পারে পূর্ণিমাকে। বলে, 'খুব বড় লদী হিলে নীচু জেইগাগুলা ডুবে। তবে ভয় নাই, পরশুরামের বোর্ডিং পর্যন্ত কুনদিন জল উঠে নি।' রাখাল দেখে ক্রমশ পূর্ণিমার চোখের মণিতে ভোরের আলো ফোটে। মুখের ওপর বিয়ের প্রথম কয়েক বছরের সবুজতা। 'হুঁ গো, পরশুরাম আর ক'টা পাশ দিলে ঘোষের ঘরের বড় ছুয়ার মত অপিসে চাকরী করবে? তখন তো আমার মেনকার কুনহ কষ্ট রইভোনি না? অনেক

টাকা বেতন পাবে। পরশুরাম দামী জামা-প্যাণ্ট পরিকি ভট্‌ভটিতে চড়িকি ঘর আইসবে। তার আর কত দেরী আছে গো ?'

রাখাল পূর্ণিমার দিকে চেয়েই থাকে। হোঁচট খায় এই বাস্তবে। কি যেন বলতে যায়, বলতে পারে না। তার বউ-এর এই সাদামাটা শরীরের ভেতরেও যে একটা ছোট্ট কুঠিরী আছে। সেখানে সে জমিয়ে রেখেছে সেই একযুগ ধরে রঙীন সম্পদ। হয়তো তা কাচের। কিন্তু তবু তা সে ভেংগে দিবে কি করে! তার কি সে অধিকার আছে ? রাখাল দণ্ধায়। তা চাপা দেয়। দিতে চেষ্টা করে। সে যেন সেই তার গ্রামের ঝুরি ঝরানো, ডাল ছড়ানো অনেক যুগের বট গাছটি। অন্ততঃ এই সময় টুকুর জন্য। সে চাইল, সেও তার বউ এর মত আষাঢ়ের প্রথম জল পাওয়া চারাপাছটি হয়। এবং আশ্চর্য হলো, সে তা পারছে ও। তার মুখেও হাসির ঝিলিক। 'আর মাত্র দু'বছর। তারপর, তুই অফিসারের মা, আর আমি অফিসারের বাপ।' দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠল। ছেলে মেয়ে গুলো ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল তাদের দিকে।

## একজন সাধারণ মানুষের গল্প

গগন কি করবে ভেবে পেল না। একবার বাম হাতের খালি ব্যাগটা আর একবার ডান হাতের মুঠোয় ক'টা টাকার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে কী বলবে বাড়ী গিয়ে লক্ষ্মীর মাকে? বেচারা বড় দুঃখ পাবে। খালি হাতে তার সামনে সে দাঁড়াবে কি করে?

পনেরটা টাকা অমন করে বড়লোকী দেখিয়ে রতনবাবুকে না দিলেই হতো। এখন গগনের মনে হলো বড় বোকামি হয়ে গেছে। কিন্তু ওরকম ছোট বড় কথা কারও সহ্য হয়? হাটের মাঝে এতগুলো লোকের সামনে যা নয় তাই বলে গালাগাল করা? গরীব বলে কি তার মান ইজ্জত নেই? সে তার অমন কি পাকা ধানে মই দিয়েছে? বারটা টাকা আগাম মজুরী নিয়ে মজুর দেয়নি এই তো। সে সময় লক্ষ্মীটার এতবড় অসুখ না হলে সে কি টাকা ধার নিত? হাজার কষ্ট হলেও অমন বজ্জাত লোকটার কাছে হাত পাতে? দশটা টাকা ধার চাইতে গেছিল, দিলনা ধার। ধড়িবাজ লোকটা সুযোগ বুঝে আরও বড় দাঁও মারতে চাইলো। বলল, 'ধারের কারবার করিনা আমি। সুদ নেওয়া মহাপাপ। তবে যদি আগাম মজুরী চাস তো দিতে পারি।' কার্ত্তিক মাসে তিন টাকা হিসাবে আগাম মজুরী নিতে তার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। আর একমাস পরেই মজুরের আকাল শুরু হবে। কম করে পাঁচটাকা মজুরী তো হবেই। কিন্তু মেয়েটার জন্য তবু তাকে বাধ্য হয়ে চারটে মজুরের দাম আগাম নিতে হয়েছিল।

আর তার দোষ হলো ধান কাটার সময় এই মজুর সে দিতে পারে নি। যেখানে ছ'টাকা সাত টাকা মজুরী চলছে সেখানে তিনটাকায় খাটতে কারো মন চায়? তবুও সে হয়তো যেত, কিন্তু পার্টি'বাবুরা সরকারী দাম ছাড়া খাটতে যেতে মানা করে দিলেন। সব মজুর ভায়েরা একটিপ হলো। গগন কি করে তাদের সাথে বেইমানী করে? আর তারা সবাই এক রা ধরে ছিল বলেই তো

আটটাকা দশ পয়সা না হোক ছ'টাকা-সাতটাকা মজুরী তো পেয়েছে। আসলে হয়েছি কি, এতদামে মজুরী দিয়ে রতনবাবুদের মতন বড়লোকদের জ্বালা ধরেছে। তাই রতনবাবু আজ তাকে বাগে পেয়ে তার উপর ঝালটা ঝাড়ল। আরো তো অনেকে আগাম নিয়ে শোধ দেয় নি। কই তাদের কাছে তো যেতে পারলি না? তাদের মুখে যে বিষ আছে। সবাই তো আর নিরীহ গগন নয়। তাই অমন করে বাপ তুলে গালাগালি দিতে বাধল না রতনবাবুর। হাটভর্তি গিস্‌গিস্‌ করছে মানুষ। তাদের সামনে এই বেইজ্জত সহ্য হয়নি গগনের। ট্যাঁক থেকে বারোটা টাকা বের করে ছুঁড়ে দিয়েছিল রতনবাবুর মুখের উপর। জ্বলে উঠেছিলেন তিনি। ভাবেন নি রতন এখুনি টাকা বের করে দিতে পারে। বাবুর আঁতে ঘা লাগল। বারোটা টাকার তিনমাসের সুদ তিন টাকা চাইতে কুণ্ঠা জাগল না তাঁর। পাপের টাকা বলে মনে হলো না। গগন তাও ছুঁড়ে দিয়েছে।

কিন্তু এখন কি করে গগন? গুনে দেখল আর মাত্র এগার'ট টাকা আছে। এই টাকায় শাড়ী হয়? তাছাড়া আরও তো হাট-বাজার আছে। লক্ষ্মীর মা আসার সময় টাকা ক'টা বের করে দিয়েছিল। তার সারা মুখে তখন আলোর ঝলকানি। বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল ক্যামন শাড়ী তার চাই। খুব বেশী রঙচঙে বড় অপচ্ছন্দ। চেক দেওয়া নানা রঙের হিজিবিজি একদম সইতে পারে না। একরঙা, লাল না হয় সবুজ পাড়। একটু মোটা যেন হয়। মোটা কাপড় গায়ে রাখলে এই শীতের সময় বেশ আরাম হবে।

গগন কথা ক'টা মনে করে বড় বিমর্ষ হয়ে উঠল। তার চোখ দুটোয় সাঁঝের ধূসর ছায়া। বড় ঝাপসা দেখাচ্ছে যেন সব কিছু। মন মানল না তার। কাপড় দোকানের সামনে গিয়ে অযথা ঘুরঘুর করল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকের কাপড় কেনা দেখল। মনে মনে নিজের বউ-এর জন্য কাপড় পছন্দ করল। তারপর বুকের উপর নিজের নাকের গরম বাতাস ফেলল। পনের-কুড়ি টাকার কমে কোন কাপড় নেই। রতনবাবুকে মনে মনে গালাগালি করতে লাগল। পোয়াতী বউটার শুকনো মুখের কথা ভেবে কষ্ট হলো। ওর জন্য বড় মায়া হল। কী এমন খেতে, পারতে দিচ্ছে। ভাতই দু'বেলা খাওয়াতে পারে না। ভালোমন্দ তো দূরের কথা। সেদিন ইলিশ মাছের কথা শুনে তার চোখ দু'টো আয়নার মতো হয়ে গেছিল। জিজ্ঞাসা করেছিল তাকে, 'অনেক দাম না ইলশা মাছের?' এটা

ওটা খেতে মন চায় পোয়াতী মানুষটার। অভাবের কথা ভেবে মুখ ফুটে চায় না কোন কিছু। একটা শাড়ী চেয়েছিল, তা ও সে দিতে পারলো না।

গগন অনেক ভেবে ভেবে ঠিক করল বাকী এগারটা টাকায় একটা ছোটমতো ইলিশ মাছ নিবে আর টুকিটাকি অন্যান্য হাট-বাজার করবে। মাছের হাটে ভীড় ঠেলেঠুলে ঢুকল। ছোট ইলিশ পনের আর বড় আঠার টাকা কিলো। ছোট গুলো থেকে অনেক বেছেটেছে সাড়ে তিনশ গ্রামের একটা নিল সে। প্রায় অর্ধেক টাকাই তার বেরিয়ে গেলো। যাক, সব দিন তো আর এমন খরচপাতি করে না। একদিন না হয় একটু বেশী খরচ হবে। তার ছোট ব্যাগ ভর্তি করে আনাজ কিনল। আলু কিনল বেছে বেছে বড় সাইজ-পাঁচশ গ্রাম। পেঁয়াজ নিল দু'শ গ্রাম। আদা দশ পয়সার। বাবুদের ঘরে আদা দেওয়া ঝোল খেয়েছে ; বড় সুস্বাদু হয়। পুরো একশ গ্রাম সরষে তেল নিল। জিরে কিনতে মন চাইছিল, হাতের পয়সার দিকে তাকিয়ে দমে গেল। অনেক বায়েনাক্কা করে দোকানীর কাছ থেকে কয়েকটা তেজপাতা চেয়ে নিল। তেজপাতার ও নাকি বেজায় দাম। বিনে পয়সায় পাওয়া যায় না। লক্ষ্মীটা বার বার বলে দিয়েছে চানাচুর নিয়ে যেতে। ছোট ছেলে কালুটা আবার ঝাল দেওয়া জিনিস খেতে পারে না। তার জন্য বিস্কুট আর লক্ষ্মীর জন্য চানাচুর কিনল।

এতক্ষণে গগনের মনটা একটু হাল্কা হল। মাছটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ক্যামন যেন তার বুকটা ফুলে ফুলে উঠল। এদিক ওদিক চাইল বাবুদের মতো করে। রাস্তায় চলতে চলতে লক্ষ্মীর মুখটাকে ভাবল। মাছ দেখে তার কাঁচ চোখ দু'টো কত চকচকে হয়ে যাবে। হয়তো নাচতে শুরু করে দিবে। ছোট ছেলেটা ও দিদির সাথে খুশীতে ডগমগ করে উঠবে। আর লক্ষ্মীর মায়ের সারা মুখে ও কি পাঁচ বছরের আগের নরম সবুজ মুখটা ফিরে আসবে না ?

তবু বাড়ীর কাছে এসে ঘরে ঢুকতে ক্যামন বাধো বাধো ঠেকছিল তার খুশী শুকনো মুখটায় খুশী ভাব টাঙিয়ে রাখতে চেষ্টা করল। লক্ষ্মীটা দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছিল। সে-ই প্রথম দেখল তাকে। 'বাবা আসচে, বাবা আসচে,' বলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। তার পিছনে ছুটতে ছুটতে এল কালু। আর পূর্ণিমা চাঁদের মতোমুখ নিয়ে লক্ষ্মীর মা বাইরে বেরিয়ে এল। লক্ষ্মী চিলের হাত থেকে মাছটা নিয়ে লাফিয়ে দুয়ারে উঠল। আনন্দে চীৎকার জুড়ে দিল

মতো ছোঁ মেরে তার 'ইলশা মাছ, ইলশা মাছ' বলে। কালু 'দিদি আমাকে দে আমাকে দে' বলে পেছু পেছু ছুটল তার। গগন দু'চোখ ভরে দেখছিল এসব চমকে উঠল বউএর প্রশ্ন শুনে। 'কি রকম কাপড় আনচ গো ?' ব্যাগটা টেনে নিল তার হাত থেকে। গগন কি বলবে ভেবে পেল না কিছু। ক্রমশ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছিল সে। বউ এর দিকে তাকাতে ও ভয় হচ্ছিল। লক্ষ্মীর মা ব্যাগ আঁতি পাঁতি করে খুঁজল। তারপর অবাক চোখে তাকালো গগনের দিকে। গগন তার বুকের ভেতর একটা শীত শীত ভাব টের পেল। কোন রকমে বলল, 'কাপড় তো আনিনি।'

'সে তো দেখতে পাইটি। আমাকে কিছু আনি দিতে হিলেই তুমার গায়ে বড় লাগে। টাকা খরচ হি যাবে না ? আর বড়লোকী দেখিকি যে ইলশা মাছ আনল, তাঁহে টাকা খরচ হয় নি ?' লক্ষ্মীর মা থমথমে মুখে বলল কথাগুলো।

গগন তার বউ এর মুখে একরাশ কালো মেঘ দেখল। মেঘের ভেতর ঝড়ের আভাষ। সেই ঝড়ে নিজেকে বড় অসহায় বোধ হলো তার। বেচারীর একটা মাত্র কাপড় ভালো আছে। অথচ সে আজ কথা দিয়ে ও কাপড় এনে দিতে পারল না। বউ এর রাগো রাগো মুখখানার দিকে তাকিয়ে সে কিভাবে কথা আরম্ভ করবে ভেবে পেল না। মুখে হাসি এনে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো ব্যাপারটা। রতনবাবুর মুখের উপর টাকা ছুঁড়ে দিয়ে ক্যামন বাহাদুরী করেছে তার বর্ণনা দিতে গিয়েও মাঝ পথে থেমে গেল। লক্ষ্মীর মায়ের তখন সাপিনীর মতো চোখ। রাগে গরগর করে যা মুখে আসে তাই বলতে শুরু করেছে। গগন বউ-এর ব্যথা নিজের বুকে টের পেল। গায়ে মাখল না এসব। কালু আর লক্ষ্মী মাছটা নিয়ে টানাটানি করছিল। মাছটার পেটের ধারালো কাঁটা যদি হাতে ঢুকে যায় ? সে তাদের ডাকল। চানাচুর-বিস্কুটের লোভ দেখাল। দু'জনে মাছ ফেলে ছুটে এলো তার কাছে। গনন তার ছেঁড়া জামাটার পকেট থেকে চানাচুর আর বিস্কুটের পোঁটলাটা বের করল। ভাগ করে দিল দু'জনকে। কচি মুখ দুটোয় সোনালী রোদের ঝিলিক। এই সোনালী রোদ তার মনের মেঘ ছাড়িয়ে বুকের গভীরে ঢুকে যাচ্ছিল। গগন রতনবাবুর গালি গালাজ, বউ এর শাড়ী, তার রাগ—সব ভুলে গেল। ভাবল লক্ষ্মীটাকে এবার থেকে স্কুলে পাঠাতে হবে। বাবুদের মেয়েদের মতো তার মেয়েও বই নিয়ে স্কুলে

যাবে। এসব ভাবতেই তার বুকের ফাঁকটা ভরাট হয়ে গেল। কিন্তু মেয়েটাকে এক আধটু পড়া দেখিয়ে দেবে কে? সে যদি অল্প স্বল্পও লেখাপড়া জানত —'অ', 'আ' টাও অন্ততঃ শেখাতে পারত মেয়েটাকে। মাষ্টার দেবার তার পয়সা কই? তবু সে তাই না হয় করবে। না খেয়ে থেকে ও সে মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবে। আর মেয়েটাই পরে কালুকে পড়াতে পারবে। পেটেরটা আবার কি হয়। সে মনে মনে ভগবানকে ডাকল যেন এবার ছেলে হয়। মেয়ে হলে বড় জ্বালা। বিয়ের পণ কোথায় পাবে সে।

ঘরের ভেতর থেকে লক্ষ্মীর মার বকুনির ওয়াজ আসছিল। সে উঁকি দিয়ে ঘরের দিকে চাইল। ব্যাগটা এখনো দুয়ারেই পড়ে আছে, মাছটা ওঠানো হয়নি। বিড়াল নিয়ে যেতে পারে। সে লক্ষ্মীর মাকে শুনিয়ে বলল, 'লক্ষ্মী, তোর মাকে মাছটা আর থলিয়াটা উঠিই লিতে ক, বিল্লী মাছ খাই যাবে।'

গগনের কথা শেষ হতে না হতেই সে তার বউ-এর গলা শুনতে পেল 'খাই যাউ সব। আমি কিছু পারবা নি। যে মাছ আনচে সে রাঁধি খাউ।'

গগন দেখল তার বউ বকতে বকতে ঘর থেকে দুয়ারে বেরিয়ে এল। ব্যাগটা তুলে বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে দেখে 'থাম, থাম' বলে ছুটে গেল সে। তার হাত থেকে ব্যাগটা ধরে নিতে গেল। তবু কয়েকটা আলু পেঁয়াজ আর কি কি যেন গড়িয়ে গেল। বউ-এর এতটা বাড়াবাড়ি ভালো লাগল না তার। কী এমন হয়েছে যে ঘরের জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে? গগন ক্রমশ গরম হয়ে উঠছিল। সন্ধ্যার এই আঁধারে কোথায় সে এখন ছড়ানো আনাজ-পত্রগুলো খুঁজবে? আলোটা জ্বালতে বলল সে। বউ গর্জে উঠল, 'আলো জ্বালবা যে তেল আছে ঘরে? ক' লিটার আনিকি রাখচ?'

গগন আর কিছু বলার ভরসা পেল না। অন্ধকারেই হাতড়াতে লাগলো। লক্ষ্মীটা আবার কালুর সাথে মারামারি আরম্ভ করেছে। সে 'ভ্যাঁ ভ্যাঁ' করে কাঁদতে আরম্ভ করল। 'দেক না মা, দিদি বিস্কুট লি লেয় তে।' কালুর কান্না শুনেই লক্ষ্মীর মা ধেয়ে গেল লক্ষ্মীর দিকে। 'না গো মা আমি তার বিস্কুট লেই নি', ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল লক্ষ্মী। 'লেইনি, আবার মিথ্যা কথা। দাঁড়া আজই তোর বারকাইটি মিথ্যা কথা কহার মঝা।'

গগন দেখল তার বউ লক্ষ্মীর চুল ধরে তাকে পিটতে শুরু করে দিয়েছে। সে ছুটে গেল সে দিকে। ছাড়াবার চেষ্টা করল। সে যত থামাবার চেষ্টা করে,

লক্ষ্মীর মা যেন ততই রেগে গিয়ে আরো মেরে চলে। গগনের মাথাটা হঠাৎ যেন আগুন হয়ে উঠল। সে ওকে এক হেঁচকা টানেই মাটিতে ফেলে দিল। তার পিঠের উপর চড়িয়ে দিল কয়েক ঘা। তারপর বউ এর চোখের দিকে তাকিয়ে ক্যামন যেন গুটিয়ে গেল। চোখ দু'টো কর্ কর্ করে উঠল তার। বুকটায় পাখির ঝটপটানি। সে তাকে ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে।

বড় ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছিল সব কিছু গগনের। ঘরে, বাইরে কোথাও কি তার জন্য একটু সুখ নাই। জীবনটার ওপর ঘেন্না ধরে গেল। কী হবে এমন ভাবে বেঁচে থেকে। কিছুই ভালো লাগছিল না। রাস্তায় চেনা জানা দু'একজনের সাথে দেখা হলে ও ঠিকমতো কথা বলল না সে।

হাঁটতে হাঁটতে গগন অনেক দূরে চলে এল। নিজের অজান্তে কখন রেলের রাস্তার কাছে চলে এসেছে। সামনেই একরাশ ঘন আঁধার জড় করে দাঁড়িয়ে আছে তার ছেলেবেলার প্রিয় বট গাছটা। এর খোপে খোপে তার ছোটবেলার অনেকটা লুকিয়ে আছে। গগন আস্তে আস্তে গাছটার দিকে এগিয়ে গেল। একটা মোটা শেকড়ের উপর বসল। কিছু ভাবতে না চাইলেও অনেক কিছু তার মাথায় উঁকি মারল। একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক চিরে বেরিয়ে এল। তার মনে হল, সে এই গাছটার নীচে অনেক অনেক কালের জন্য শুয়ে থাকে। আজকের মতই গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদ এসে তার গায়ে জড়িয়ে ধরে থাকুক। সে ভুলে যাক তার বর্তমান সব কিছু—নিজেকে, নিজের বউকে, ছেলেমেয়েকে। এখন তার গা ছুয়ে বয়ে যাচ্ছে হিম হিম উত্তুরে বাতাস। আকাশে ভরা চাঁদ। অথচ তবু তার চারিদিকে একটা আঁধারের চাদরের আবরণ অনুভব করছিল। তার মনে হল বসন্ত বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। হঠাৎ তার মনে পড়ল এই বটগাছটার সামনেই গত বছর কম বয়সী একজোড়া স্বামী-স্ত্রী একসাথে চলন্ত রেলের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিল। সে লাঙ্গল ফেলে ছুটে এসেছিল এদিকে। কাটা মাথাগুলোর চোখের দিকে তাকিয়ে খুঁজে ছিল অনেক কিছু। বড় বেশী বাউল বাউল ভাব জেগে উঠছিল তখন তার মনের মধ্যে। সে যেন এখনো দেখতে পাচ্ছিল ওদের মৃত চোখের শীতল চাউনি।

আর অমনি গগন চমকে উঠল। তার বউও যদি......। সে ভাবতে পারল না আর, মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। তার চারদিকের কোন কিছুই

দেখতে পাচ্ছিল না সে। শুধু চোখের সামনে ভাসছিল ঐ বউটার কাটা মাথার মতো লক্ষ্মীর মায়ের মাথাটা।

গগন ছুটতে লাগলো ঘরের দিকে। পৌষেও তার সারা গায়ে জমে উঠল জবজবে ঘাম, বুকে হাতুড়ি পেটার শব্দ। তার ঘরের কাছে পৌঁছে ঘর অন্ধকার দেখল। ভয়টা যেন এতে আরো বেড়ে উঠল। একলাফে দুয়ারে উঠে এল সে। মুহূর্তের মধ্যে কপাট ঠেলে ঢুকল ঘরের ভেতর। ভালো করে চারদিক তাকিয়ে দেখল। এতক্ষণে যেন তার ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। বউ-এর ঘুমন্ত শরীরটার দিকে তাকিয়ে তার সারা মন ভোরের কপোতের মতো হয়ে গেল। ছেঁড়া শাড়ীটাতে পোয়াতী বউ-এর ভারী শরীর তার স্বপ্ন মনে হলো। লক্ষ্মীটাকে ডিঙিয়ে তার কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল গগন। আস্তে আস্তে ডাকল তাকে। সাড়া পেল না, গগন আরো সরে এলো। বউ-এর একদম কাছে। তার কোমরে হাত দিয়ে ঠেলা দিল। বউ ঘুম জড়ানো স্বরে বলল, 'লাগাওনি আমার সাঙে। ভাত, তরকারী সব ঢাকান্ আছে। খাই লও যাও।'

গগন হঠাৎ উতলা হয়ে উঠলো। খপ্ করে বউ-এর মাথাটা তুলে নিল নিজের কোলে। নিজের মাথাটাকে নামিয়ে আনল ওর মুখের উপর। চালের ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়া চাঁদের আলোয় বউ-এর ভেজা ভেজা চোখে সে দেখল আরও একটা চাঁদ। সে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল সেই দিকে। ধীরে ধীরে বলল, 'আগের হাটে দেখবু ঠিক তোর জন্য গটে ভালা শাড়ী আনি দিবা।' লক্ষ্মীর মায়ের ভেজা চোখে তখন আলোর ঝিলিক। সে নূতন বউ-এর গলায় বলল, 'হুঁ গো, তুমি যখন রতন বাবুর মুঁহের উপর টাকাটা ছাঁটি দিল তখন তাকে ঠিক পেঁচার মত দেখিত্‌লা না?'

## সমর

ডাঃ মুখাজীর্'র চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল সমর। হাতের প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌টার দিকে চাইল। চেয়ে রইল। তার মনে হলো, এভাবে অসুস্থ হওয়াটা কি তার উচিত হচ্ছে? সে ভ্রূ দুটোর মাঝে কপালটা কুঁচকে আবার মনে মনে বললো, এখন অসুস্থ হওয়াটা কি তার উচিত? ডাঃ মুখাজীর্'র মত বড় ডাক্তারের ফি দেওয়া, এই লম্বা প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌টা মাফিক ওষুধ কেনা। কমপক্ষে রোজ এক পোয়া করে দুধ খাওয়া, একি তার উচিত হচ্ছে? দু'শ টাকা মাস মাইনের কো-অপারেটিভ সোসাইটির সেল্‌সম্যান সে। তার কি অসুস্থ হওয়া সাজে! তার কি এসব উচিত! তার কি উচিত! তার কি উচিত? তার কি উচিত?

সমরের বুকের ভেতর গরম বাতাসের ঘূর্ণি। রক্তের আছড়ে পড়া ঢেউ। পাড় ভাঙে। ঝলাৎ ঝলাৎ শব্দ ওঠে। ওর হাতের দশটা আঙুল গুটিয়ে আসে—চেপে বসে চেটোর ওপর। দাঁতের ওপর দাঁত। সে দেখেও দেখে না সামনের ইলেকট্রিক তারের ওপর বসা দুটো শালিক, ঐ দোতলা বাড়ীটার ছাদে সদ্যস্নাতা মেয়েটি, তারের উপর ভেজা শাড়ী আর রাস্তার একধারে শুয়ে থাকা আধোলোম ওঠা একটা কুকুর। আসলে সে ভাবে তার এসব দেখা কি এখন ঠিক হবে? তার বয়স যে এখন ছাব্বিশ। তার বাবা যে ষাট পেরিয়ে গেছেন। তার এক বোনের বয়স যে এখন আঠারো। তার দাদার বৌ আছে, ছেলেমেয়ে আছে অথচ তার কব্জীর জোর যে শূন্য। এসব বিলাসিতা কি তার মানায়? এসব কি তার উচিত!

আজ রবিবার। তাকে কাজে যেতে হবে না। আজ তার ছুটি। আচ্ছা ছুটি মানে কি? সমর ভাবল ছুটি কি। ছুটি কোথেকে। আজ কি সে তার বন্ধুদের সাথে সত্যদার দোকানে দুপুরতক আড্ডা দেবে, না দিতে পারে? বিকালে শুভাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবে, সন্ধ্যায় কি 'বাসন্তী'তে সিনেমা দেখবে? এইসব কি ছুটি? সে কি পারে এসব! তার কি এখন......

সমরের মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। তার ফ্যাকাশে হাতের বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনী দিয়ে টিপে রাখে রগ দুটো। একসময় 'ধ্যুস' বলে হাত নামিয়ে, মাটি কাঁপিয়ে পা ফেলতে শুরু করে। তেজী আরবী ঘোড়া হতে চায় কিংবা ক্ষ্যাপা বাইসন। তার যদি একটা স্কুটার থাকত, সে শুভাকে পিছনে বসিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে অনেক দূরে উড়ে যেত—দীঘা কিংবা পুরীটুরী। তার যদি অনেক টাকা থাকত বোনটাকে কোন এক লালটুস মার্কা সুপুত্তুরের হাতে সঁপে দিত। দাদাকে বলতো কি ব্যবসা করবে ভাবছো? কত টাকা চাই তোমার? তার যদি উঁচু অনেকটা টাটাদের মত বাড়ী থাকত তবে সবচেয়ে উঁচু তলায় বাবাকে নিয়ে গিয়ে বলতো, 'এর চেয়ে আর কত উঁচুতে ওঠা যায় বলে ভেবেছিলে তুমি। আর ঠিক তখন হয়তো মায়ের উদ্দেশ্যে বলত, 'তুমি কি বোকা মা, এত তাড়াতাড়ি পালিয়ে গিয়ে আর কত উঁচুতে উঠেছ তুমি?'

তবু সমরের পা তিন বছরের ছোট ছেলের মত হয়ে যায়। ডাঃ মুখার্জী বলেছেন রেষ্ট নিতে। এই সার ওজন করা চাকরী দেহের পক্ষে স্যুটেবল নয়। ওর গ্যাস তার অসুখের পক্ষে মারাত্মক। সত্যিইতো এ চাকরী থেকেও কি, না থেকেও কি। ছেড়ে দেবে কি তবে? ছেড়ে কি দেওয়া যায়? ওরা এবার বেতন বাড়াবার জন্য কমিটির কাছে আবেদন করেছিল। কমিটি বলেছে, কাজের জন্য লোকের অভাব নেই। ভারতবর্ষে নাকি এর অর্ধেক মাইনেতেও কাজ করার জন্যে বেকার ছেলেরা মুখিয়ে আছে। তবে কি সে চাকরীটা ছেড়ে দিবে? কিন্তু—। আসলে ওর একটা স্টেনগান চাই। ছাব্বিশ বছর বয়সে স্টেনগান হাতে নিশ্চয়ই ভালো মানাবে তাকে।

সমরের গতকালের নিজের লেখা কবিতাটার কয়েকটা লাইন মনে এলো। 'জানি কোনকালে শহীদ হবো না / তাই এখনও বেঁচে আছি / ভাত নিয়ে আন্দোলন করি। গুলি টিয়ার গ্যাস খাই / কবিতা আওড়াই।' শুভা কবিতাটা শুনলে কি বলবে? কি বলতে পারে। ও হয়তো কবিতাটা বুঝতেই পারবে না। আসলে শুভা তাকেই কি ঠিক মতো বুঝতে পেরেছে? বেচারা! চার বছর ধরে এত কাছে এসেও সমরের সমরত্বকে ধরতে পারলো না। ওর চোখের সবুজ নেশা, ভোরের যুঁই-এর মত হাসি—সমরের ভীষণ কষ্ট হয়। সে মনে মনে শুভার উদ্দেশ্যে বলে, 'তুমি এমন হলে কেন শুভা? আমার শরীরে কত তাপ দেখেছ? সইতে পারবে না—তুমি ঝলসে যাবে।' সে কি চিৎকার

করে উঠবে মেহের আলীর মতো, 'তফাৎ যাও' বলে। সে মনে মনে বলল, 'শুভা, জানি তুমি আমার রক্তের মধ্যে সংপৃক্ত হয়ে আছো, তোমাকে ছাড়া আমার অস্তিত্ব কল্পনাও করতে পারি না। তবু তুমি পালাও, তফাৎ যাও— আমি তোমার মৃত্যু দেখতে পারি না।'

সারা সকাল, সারা দুপুর, সমর যুদ্ধ করল। রক্তাক্ত হলো। আর কী যেন এক আক্ষেপে দাঁতে দাঁত চেপে সমুদ্রের মত ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো। তার মনে হলো সে যেন একটা ক্ষ্যাপা কুকুর হয়ে যাচ্ছে। বোনটার শাড়ীর আবদারে সরোষে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। বাবার সাধারণ কথায় কামড়াতে ছুটে গেল। আর গর গর করে দাঁত শানাতে লাগলো কোন এক অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে। বাড়ীটাকে মনে হলো তার শত্রুপুরী। সে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল ওর একদা প্রিয় ছোট্ট দাঁতন শহরটাতে। শহর পেরিয়ে ফাঁকা মাঠ, চাষের জমি, সবুজ কচি ধানের গাছ—সে হেঁটে যেতে লাগলো ঘেসো আলপথ দিয়ে। সাঁওতাল পাড়া, শুকর-হাঁস-মুরগী আর কালো কালো বাচ্চার পাল, নিটোল সাঁওতাল যুবতী, রাগী বলদের মত সাঁওতাল যুবক—এদের মাঝে সে যেন কী খুঁজতে লাগলো। হয়তো বা নিজেকে। ছেলেবেলায় মাটি ও মাটির মানুষ বড় ভালোবাসত ও। এখনো কি সে ভালোবাসে? তবে তার বুকের ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা কেন? কোথায় যেন একটা বড় বেশী ফাঁক থেকে গেছে। কেউ কি তাকে এক ফোঁটা শান্তি দিতে পারে? শুভাও কি পারবে?

সমরের হঠাৎ মনে পড়ল আজ তার শুভার সাথে দেখা করার কথা ছিলো। ও হয়তো তার অপেক্ষায় আছে। সে কি তার ওপর অবিচার করছে না? তার কি এসব পাগলামী হয়ে যাচ্ছে না? তার কি এমন করা সাজে? তার কি এভাবে ক্ষেপে ওঠা উচিত? তার বুড়ো বাবা আছে না? তার বেকার দাদা আছে না? তার গোলাপের মত এক প্রেমিকা আছে না? তার দু'শ টাকা মাস মাইনের চাকরী আছে না? তার কি এমন অসুস্থ হওয়া, পাগলামী করা সাজে? উচিত হচ্ছে কি তার। এসব কি উচিত?

সমর মাঠের সবুজ বুকের ওপর নিজের বুকের তপ্ত-বাতাস ঝরালো। আর ডুবন্ত সূর্যের বিদায়ী আলোয় খুঁজতে লাগলো অনেক কিছুই—বড় স্বপ্নীল তার রঙ, বড় মোহিত করা তার গন্ধ, বড় ঈপ্সিত সে জগৎ। কী যেন একটা সে বড় ভালোবাসত।

সমর শুভাদের ঘরে পেঁছে বুঝতে পারলো সত্যিই শুভা তার অপেক্ষায় ছিলো। ওর জলজলে হয়ে ওঠা চোখের তারার দিকে তাকিয়ে সমর বললো, 'একটু দেরী হয়ে গেল।'

শুভা বললো, 'আমি ভাবছিলাম তুমি বুঝি আজ আর আসবেই না।'

'কেন? ওরকম ভাবছিলে কেন? না এসে কি আমি থাকতে পারি?'

শুভার মুখে শুকনো ফুলের হাসি। সে বলে, 'জানি তো তোমাকে। ভাবছিলাম হয়তো কোনো পাগলামি চেপেছে তোমার মাথায়।'

সমর চেয়ে রইল শুভার দিকে। বহু দেখা শুভার মুখ, চোখ, চোখের মণি —তবু সব যেন কবিতার মতো মনে হয় তার। ওর সামনে এলে বুকের রক্তে কোকিলের ডাক শুনতে পায় সে। কেমন যেন হয়ে যায় তখন। তার গলার স্বর নালীটার উপর কী যেন জমে আসে। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'আমি তোমাকে খুব কষ্ট দেই, না শুভা?'

শুভা চোখ তুলে তাকায় সমরের দিকে। তাকিয়েই থাকে। ওর চোখের কোণে মুক্তো জমে। ও যেন অনেক অনেক কথা বলতে থাকে চোখের ভাষায়। সমর সব হারিয়ে ফেলে—সমস্ত কিছুই, শুধু শুভাকে ছাড়া। শুভাও কী যেন খোঁজে সমরের চোখের ভেতর। জিজ্ঞাসা করে 'এখন শরীর কেমন তোমার?'

সমর বলে, 'ভালো, দেখছ না ডঃ মুখাজীর ওষুধ খেয়ে কেমন তাগড়া চেহারা বানাচ্ছি।' সমর তার শুকনো মুখে আপ্রাণ চেষ্টা করে হাসি আনতে। শুভাও বাসি চাঁপার হাসি হাসে। বলে, 'ছিঃ, ওকথা বলতে নেই।' তারপর দু'জনেই অনেক অনেক কথা বুকে ধরে রেখে নীরব হয়ে যায়।

পাশের ঘর থেকে শুভার ছোট ভাই তপু এসে বলল, সমরদা একটা অঙ্ক করে দিন না। জানেন, দিদিও অঙ্কটা পারে নি।'

সমর বইটা টেনে নেয়। বলে, 'কোনটা'?

তপুর দেখিয়ে দেওয়া অঙ্কটা কষতে কষতে সে এক সময় জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁরে তপু, তুই বড় হলে কি হবিরে?'

তপু একটুও চিন্তা করে না। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'ডাক্তার।'

সমরের হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে। সে তপুর দিকে, তপুর সবুজ বুকটার দিকে তাকিয়ে আনমনা হয়ে যায়। তার বুকটা চিনচিন করে ওঠে। চোখে গরম ভাপ। সমর তাড়াতাড়ি চোখ দু'টো নামিয়ে নেয় খাতার

দিকে। পেনটাকে চেপে ধরে খাতার ওপর। অংকটার উত্তর মেলায়। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আজ আসি শুভা।'

শুভা অবাক হয়ে যায়, 'এক্ষুনি তো এলে, এরি মধ্যে উঠবে কি !'

সমর অনেক কষ্টে মুখে নকল হাসি আনে। বলে, 'অনেক কাজ আছে আজ, পরে আসব আবার।'

'চা-টা অন্ততঃ খেয়ে যাও। পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে। একটু খানি বসো।'

সমর চোখ রাখে শুভার চোখের ওপর। ওর মিনতি ভরা চোখ। তবু সমর পারে না। ওর সারা বুকময় একটা যন্ত্রণা কুরে কুরে খাচ্ছিল। রক্তের ভেতর আগুনের আঁচ। সে লুকিয়ে রাখতে চায় সব। পালিয়ে যেতে চায় দূরে।

শুভাও সমরের পেছু পেছু আসে। গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে দেয়। জিজ্ঞেস করে, 'কই জানতে চাইলে না তো, বাবা-মা-দাদা—ওরা সব কোথায় গেছেন।'

সমর পেছন ফেরে। তাকায় শুভার দিকে। প্রশ্ন করে চোখের ভাষায়। শুভা ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে থাকে। ওর ঠোঁট দু'টো কাঁপে। কাঁপে সারা বুক। সব শক্তি খরচ করে বলে, 'আমার জন্য পাত্র দেখতে গেছেন।' তারপর ছুটে ঘরের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে নেয়।

সমর যেন জড়ের মতো হয়ে যায়। মাথার মধ্যে প্রচণ্ড একটা শব্দ—ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় গুঁড়িয়ে দেওয়ার মত। একটা যেন লাভার স্রোত। সে আইসক্রীমের মতো গলে যেতে থাকে। তবু সে একসময় আবিষ্কার করে—সে হাঁটতে পারছে। সে ভাবতে পারছে যে সে সমর—ছাব্বিশ বছরের এক যুবক। তার দু'শ টাকা দামের স্যালসম্যানের চাকরী আছে, তার অক্ষম বাবা আছেন, তার বেকার দাদা আছে, তার কুমারী বোন আছে, আর শুভা নামের এক মেয়েকে সে ভালোবাসে যার বাবা-মা-রা ওর হবু স্বামীর খোঁজে গেছেন। সে আরও ভাবতে পারে, আজ রবিবার। ছুটি। এখনো সারা রাত বাকী। সে নিজের ইচ্ছে মতো এই রাতটুকু হয়তো কাটাতে পারে। আকাশের তারা দেখতে পারে, নাচতে পারে, গাইতে পারে, ছোটাছুটি করতে পারে রাস্তাগুলোয়। অথচ সে তার দু'হাতের মুঠোয় চেপে পৃথিবীটাকে গুঁড়িয়ে দিতে পারে না। উঁচু উঁচু বাড়ীগুলোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারে না। ছুঁড়ে দিতে পারে না তার দু'শ টাকা দামের চাকরীটা।

সময় বুঝতে পারে তার বুকের খাঁচাটার বাতাসে ঝড়ের মাতন শুরু হয়েছে। রক্ত ফুটছে। সে চিৎকার করে ওঠে 'শুভা তুমি তাফাৎ যাও। দেখ, আমার সারা গায়ে কেমন আগুন জ্বলছে। আমি এই আগুনে ওদের স্বর্ণ লঙ্কাটা পুড়িয়ে দেব। ওরা চিৎকার করে উঠবে। মৃত্যু ভয়ে ওদের ফ্যাকাশে মুখ-গুলোর বাঁচায় করুণ আকুতি দেখে আমি হেসে উঠব বাতাস কাঁপিয়ে।'

সময় হঠাৎ নেতিয়ে যায়। ঝিমিয়ে পড়ে তার দেহের অসুস্থ কলকব্জা গুলো। সে আকাশের ধ্রুবতারাটা খুঁজতে খুঁজতে ভাবে আর কয়েক ঘন্টা পরেই রবিবারটা শেষ হয়ে যাবে। আগামীকাল আবার সোমবার।

# দুখীরামের শখ

দুখীরাম সরকারী ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে দেখল সূর্যটা ঠিক মাথার উপরে নয়, একটু যেন পশ্চিমে ঢলে। সূর্য তো নয়—আগুন, আগুনের হলকা ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে এসে পড়ছে মা ধরিত্রীর উপর। মা ধরিত্রীও রেগে মেগে লাল। তিনিও যেন তাঁর বুকের সব তাপ উগরে দিচ্ছেন। তার পায়ের নীচে সেই আগুন, পা রাখাই দায়। সে কয়েক পা এগিয়েই কাহিল হয়ে পড়ল। এদিক ওদিক চাইল ছানিপড়া চোখে। কোথাও যদি ছায়াতে দু'দণ্ড দাঁড়াতে পারা যায়। তার চার কুড়ি বছরের পোড় খাওয়া শরীর—তবু কি সহ্য হয় এই কড়কড়ে তাপ! মাথার ভেতরটা দপ্‌দপ্‌ করে। এইখানে কোথাও যেন একটা বটগাছ ছিল। এখন শুধু বড় বড় পাকা বাড়ি। আটকে যায় চোখ। দুখীরাম বিড় বিড় করে, বোধ হয় নিজেকে শুনিয়েই বলে, 'দাতুন শহরটা বড় বদলি যাইচে হে।'

গত কয়েক বছর ধরে যে কি হয়েছে দুখীরাম ভেবে পায়না। তের সন গেল বন্যায়, গত সনে বৈশাখ থেকে বেশ জল হয়েও আশ্বিনে ঠিক ধানফোলার মুখে জমি ফেটে চৌচির। আর এই সনে তো সেই পৌষের এক পশলার পর আর এক ফোঁটাও জল ঝরেনি ওপর থেকে। এই বৈশাখ মাসে কি জব্বর খরাটাই না হচ্ছে, ফুটি ফাটা খরা। মা ধরিত্রী হাঁ করে তাকিয়ে আছে আকাশ পানে। দুখীরাম তার ভাঁজপড়া কপালে আরও ভাঁজফেলে ভাবলো কথাগুলো। ঠোঁট চাটল জিভ দিয়ে। শুকনো ঠোঁট, নোনা নোনা। বেশ লাগলো স্বাদটা তার। তবে বিপদও বাড়ল। মরে যাওয়া খিদেটা আবার চাগিয়ে উঠল। সেই সাত সকাল থেকে সে বেরিয়েছে। সরকারী ডাক্তারখানা লোকে লোকে গিস্‌গিস্‌ করছে। এত লোক ও জন্মেছে এই দেশে, আর লোকের এত অসুখও হয়েছে আজকাল। বসে বসে তার কোমর ধরে কাঠ। খিদের পেট চোঁ চোঁ করছে। আর খিদেরই বা কি দোষ, সেই সাত সকালে কী যেন খেয়েছিল চট্টিখানি। 'দু গেরাস পাখাল' বলে মনে হল তার। তাও কানুর ছোট ছেলেটা বসে গেল এসে। প্যাট্‌কাটা

বড় ন্যাওটা তার। আহা, কচি মুখে খিদে একটু বেশীই হয়। সে কি না করতে পারে? তা সেই খাওয়াও কতক্ষণ হয়ে গেল। ডাক্তারখানার মধ্যে-ই তখন পেটটা মোচড় দিয়ে উঠেছিল, সে গ্রাহ্যি করেনি। এই রকম কতদিন কাটে। তা আর কি করা? ভগবানের দিন যখন যেমন যায়। দুখীরামের বুকটা ভারী হয়ে আসে। তবু সে কারও উপর রাগ করতে পারে না।

কিন্তু এখন তার মনে হলো শুধু শুধু এত কষ্ট পোয়াতে হলো তাকে। কানু আসতে না বলেছিল। জোর করেই একরকম এসেছিল সে। ডাক্তার-খানার ওষুধ খেয়ে কত লোকের কত কি অসুখ সারে, তার মরে আসা চোখ দুটো আর কিছুদিন যদি আলো ধরে রাখতে পারে। এই যে চারিদিক শুধু আঁধার আর আঁধার, পাঁচ হাত দূরের জিনিস পত্তরও আজকাল দেখতে পায়না ঠিক-ঠাক। শুধু হাতড়ে বেড়ায়। এটা ওটা খুঁজতে গিয়ে গুলিয়ে ফ্যালে। বুকটা তখন বড় ভারী ভারী বোধ হয় তার। 'চোখ নাই রহার বড় দুঃখ হে'। তার মনে হয় এই পৃথিবীর আকাশ, গাছপালা, মানুষজন, ফুল-ফল, পশুপাখি—সে কিছুই দেখতে পাবে না আর। সূর্য উঠবে। আলো খেলবে চৌদিকে। ফুল ফুটবে। পাল পাল গরু যাবে মাঠে। মানুষজন মাতবে কাজে। মাঠ ভর্তি পাকা পুরুষ্টু ধান, আর মানুষের সারা মুখময় রোদের মত হাসি। অথচ সে কিছুই দেখতে পাবে না। তার কাছে সব এক—শুধু আঁধার আর আঁধার। কথাটা ভাবতেও হিম হয়ে আসে তার বুক। একটা শীত ভাব টের পায় রক্তের ভেতর।

অথচ ডাক্তারখানার ছোকরা ডাক্তারটা বলে কিনা, 'কত বয়স হলো দাদুর? চার কুড়ি? এখনও দেখার শখ?' ছোকরা ডাক্তারটার মুখের হাসি মনে পড়তেই দুখীরামের পেটের ভেতর থেকে একটা তেতো ভাব গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠে এল। দেখা কি শখের? মানুষ হাসে, কাঁদে, ভাত খায়, বউকে সোহাগ করে —সব কি শখ! 'হুঁ, বড় জব্বর শখ তার। ওউ বুড়া বয়সে দ্যাখার শখ।' সে ঘাড় নাড়ল স্প্রিং এর পুতুলের মত। ভালো নাকি হতে পারে অপারেশন করে ছানি কাটালে। মেদিনীপুরের সদর হাসপাতালে যেতে হবে। ম্যালা খরচ। এত টাকা সে কোথায় পাবে। বড় ভয়ও লাগে তার এই কাটাছেঁড়াকে।

'তবে কি মোর দ্যাখার মেয়াদ শেষ?' কথাটা ভাবতেই সব যেন ক্যামন হয়ে আসে দুখীরামের। মুখের ভেতর বড় বিস্বাদ—তেতো তেতো। হাতের

ভেতর লাঠিটা আলগা হয়ে আসে। বুকে বাড়তে থাকে খরা। বড় পুড়ে পুড়ে যায় ভেতরটা। এখন তবু হয়ত আর কিছুদিন দেখতে পাবে। তারপর সব শেষ—শুধু রাত আর রাত। কালো গাঢ় আঁধার লেপটে থাকবে তার চোখে। দুখীরাম তার ছানিপড়া চোখ দিয়ে শিশুর দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো চারিদিক। যেন সে গিলে ফেলতে চায় চোখ দিয়ে। যেন সব কিছু পারলে সে বুকের উপর তুলে নেয়। জমিয়ে রাখে ভবিষ্যতের জন্যে। তবু ঠাওর করতে পারে না সব। তার নিভন্ত চোখ কি সব খোঁজে, কত নতুন ঘর, দোকান পাট। 'উঃ বাপ, অত উঁচা উঁচা পাকা ঘর! কবে হিলা সব।' সে অবাক হয়ে যায়। 'ক বছরে দাঁতুন শহরটার অত বদল! কলকাতায় নাকি আরো বড় বড় সব ঘর আছে, ম্যাঘের সমান উঁচা।' কানু সে বছর মিটিং গাড়ীতে কলকাতায় গিয়ে দেখে এসেছে। ফিরে এসে সে যত গল্প করে কলকতার, তত দুখীরামের চোখ উপরে উঠে আসে। এখন সে কপালের হিজিবিজি ভাঁজের ভেতর আরও নতুন ভাঁজ ফেলে ভাবল, 'তবে কি দাঁতুন শহরবি একদিন কলকাতা হি যাবে!'

দুখীরাম এটা ওটা ভাবতে চেষ্টা করল। নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চায় সে। তবু পেটের ভেতরের খিদেটা মাঝে মাঝে জানান দেয়। এই দোমড়ানো শরীরটা নেতিয়ে পড়তে চায়। গলা ক্রমশ কাঠ হয়ে আসে। থুথু চাটে সে। পা চালায়। এদিক ওদিক চায়। জলের কল খোঁজে। পুরানো ডাক্তারখানাটা সামনে বোধ হয়। সেখানে একটা জলের কল ছিল বলে মনে পড়ে তার। সে যেন এক্ষুনি জলের স্বাদ পায়। হিম শীতল মিঠে জল। বোশেখে জল বড় অমৃত হয়।

তবু দুখীরাম হারিয়ে ফেলে পুরাতন ডাক্তারখানা। তার নিভে আসা চোখের মনি ভুল করে। সে আগুন হওয়া রাস্তার উপর দিয়ে এগোয়। লোকজন নেই, খাঁ খাঁ করছে চারদিক। ঘরদোরগুলোর কপাটও সব বন্ধ। এই আগুন ঝরা দুপুরে এখন হয়তো সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আগে এইখানে কোথায় যেন ঝাটো-বাবুর খাবার দোকান ছিল। এখন কি আর আছে? ঝাটোবাবু গেলেন সেই বন্যার বছর। তার দোকানটা থাকলে জল চেয়ে খেয়ে নিতে পারত সে।

একবার অনেক বছর আগে সে বছর কী খরা! খানা-ডোবা, পুকুর সব খাঁ খাঁ। আকাশে মেঘ নাই। সারা দিনমান শুধু আগুনের হল্‌কা। এই বাজারের

বড় বড় বাবুরা সবাই মিলে জলসত্র খুললেন। কালী বোষ্টম জল আর গুড়মাখা ভেজা ছোলা নিয়ে বসে থাকত। সে তখন বেশ ছোট। রামরতনবাবুদের বাড়ীতে রাখালি করে। ছোলা গুড়ের লোভে যখন তখন জল চাইত কালী বোষ্টমের কাছে।

কালী বকত। বলত, 'তোর ম্যানকার জন্য মোর কাজটা রইভ্যানি দেখিটি। বাবুম্যানে দেখলে আর আস্ত রাখবে?' তবু সে তার হাতে একটু গুড় আর ছোলা দিয়ে বলত; 'যা ভাগ, আজ আর আইসবুনি খবরদার।'

দুখীরাম গরম বাতাস ফেলল বুকের ওপর। বাম হাতের ছায়া চোখের ওপর ফেলে রাস্তার দুধারের দোকানগুলোকে ঠাওর করার চেষ্টা করল। সামনের খাবার দোকানটা আশা ছড়ালো তার মনে। তবু কিছুটা সঙ্কোচবোধ। ঝুলন্ত দাঁড়িপাল্লার মত এদিক ওদিক হল সে। কিছুক্ষন টানাপোড়েন। তারপর এক সময় দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উঁকি মারল ভেতরে। দোকানের কাজ করা ছেলেটার কাছে জল চাইল। এই ভর দুপুরে দোকান একদম ফাঁকা। ছেলেটা রেডিও শুনছে। তার দিকে একবার তাকিয়েই আবার গান শুনতে লাগলো। কাঠের পয়সা রাখা বাক্সটায় মালিকের ঘুমন্ত মাথা। দুখীরাম চিনতে পারল না তাকে। ক্রমশ উত্তাপ বিঁধছিল তার বুকে। বেহায়ার মত বার বার জল চাইতে লাগলো। মালিক ঘুম জড়ানো চোখে তাকালো তার দিকে। সে দেখল সে চোখেও বোশেখের দুপুর। সে ঝলসাতে লাগলো এই সব বহুবিধ তাপে। কিন্তু তবু তার কুকুর হয়ে যেতেও বাধলো না। ছেলেটি বিরক্ত হয়ে গাল দিতে দিতে এক গ্লাস জল এনে দিল।

দুখীরাম চোঁ চোঁ করে জলটুকু গিলে ফেলল। শূন্য পেটে জলটা পেঁছিতেই মোচড় দিয়ে উঠলো। ট্যাঁকে দু' একটা পয়সা থাকলে বড়ো ভাল হত। অনেকদিন আলুর দম খায়নি সে। খিদেটাও একটু মরত। আর জলের জন্যও এমনি হেনস্তা হতে হতো না। পুরো তেষ্টাও তো মিটল না তার। কিন্তু সে আর জল চাইতে ভয় পেল। যাক, অন্ততঃ গলাটা একটু ভিজেছে। ঘর গিয়ে বেশী করে খাবে ক্ষণ। অনেক বেলা হয়ে গেল বোধ হয়। হয়তো তার ছেলের বৌ, নাতি-নাতনীগুলো সব ভাবছে তার জন্য। কানু এখনও কাজ থেকে ফেরেনি নিশ্চয়ই। সে তো আসবে সেই মিলের আড়াইটের ভোঁ বাজবার পর। কানুর বৌ কি ছেলেমেয়েগুলোকে খাইয়ে দাইয়ে শুয়ে পড়েছে এতক্ষণে?

সে এই গরম মাটির ওপর দিয়ে আরো জোরে জোরে পা চালাবার চেষ্টা করল। এখনও তো তার গাঁয়ে পেঁছিতে আধ ক্রোশটাক বাকী। সে যেতে যেতে কি মিলের ভোঁ বেজে যাবে? তার মনে হলো এই বোশেখ মাসটা বড় কষ্টের। বড় পোড়ায়, বড় দুঃখ আনে বুকে। হয়তো সে আসছে বোশেখে এই পৃথিবীতে আর থাকবে না। আচ্ছা সে মরার পর কোথায় যাবে—স্বর্গে না নরকে? তার কি অনেক পুন্য আছে, স্বর্গে যাওয়ার মত পুন্য। সে কি অনেক পাপ করেছে! কই কিছুই মনে পড়ে না তার। কানুর মা কোথায় গিয়ে পেঁছিছে কি জানি? বড় ভালো ছিল বউটা তার। বড় সাদাসিধে আর দরদী। দুখীরামের মনটা ক্রমশ ভিজে যেতে লাগলো। গর্তে ঢোকা চোখ দুটো তার আরো গভীরে ঢুকে আঁতি পাতি করে খুঁজতে লাগলো অনেক কিছু। বড় ভয় হতে লাগলো তার। মরনের ভয়। এই গরমেও বুকের ভেতর শীত শীত ভাব। যদি নরকে যেতে হয় তাকে। নরকে নাকি বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রনা। সে এখনই যেন বুকের ভেতর যন্ত্রনাটা টের পেল। আরও যদি অনেক অনেক দিন বাঁচতে পারতো সে। বড় বাঁচার সাধ তার এই পৃথিবীতে। সে বিড়বিড় করে বলল, 'এই পৃথিমীটা বড় সুন্দর হে, বড় সুন্দর।'

মাথার উপর কড়কড়ে রোদ, বুকের ভেতর শুধু ভয়, পেটে খিদে আর শুকিয়ে যাওয়া কন্ঠনালী—এই সব নিয়ে দুখীরাম ঘরে এসে পেঁছিল। সূর্য অনেকটা পশ্চিমে ঢলে পড়েছে তখন। তার ঝুপড়ি ঘরটা নিঃঝুম। সে দুয়ারে বসে গামছাটা দিয়ে বাতাস করতে লাগলো। প্যাটকাকে ডাকল কয়েকবার। কারও সাড়া পেল না। উঁকি দিয়ে দেখল ঘরের ভেতরটা। সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে গেছে। বাঁশের কপাটটা খুলে ভেতরে ঢুকল। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজলো কলসী আর ঘটিটা। কলসীটা তুলে জল ঢালতে গেল। বড় ভার, তার শুকনো হাত দুটো কেঁপে উঠল। চোখ দুটোয় আরো বেশী আঁধার। সারা গা জুড়ে শূন্যতা। কী যেন হারিয়ে গেল তার। সে কিছুই বুঝতে পারল না। কলসীটা হঠাৎ ঘটিটার উপর পড়ে গেল। সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল, ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়া কলসী আর গড়িয়ে যাওয়া স্রোতের দিকে।

ছেলের বউ লাফিয়ে উঠল বিছানা ছেড়ে। দুখীরামের বড় ভয়। সে তার ছেলের বউ এর চোখের দিকে চাইল অপরাধীর দৃষ্টিতে। ভাবল বাইরের বোশেখের দুপুরটা কি ঘরের ভেতরেও উঠে আসবে। সেই খরা কি ঢুকে যাবে

তার বুকের ভেতর।

ছেলের বউ তখন ফনাধরা সাপিনীর মত। আর নীল চকচকে বিষ গড়িয়ে পড়ছিল মুখ থেকে, 'দিল তো ভাঙ্গি। তুমাকে কতবার কইচি না, যে কাজ পারবনি তাঁহে হাত দিব নি। খালি সব কাজে অস্থির। অখন খাও কত জল খাব। আমার অত শখের কলসীটা, দেড় টাকা দিকি আনথিলি মঙ্গলবার হাটনু......'

দুখীরাম যেন পালাতে পারলে বাঁচে। সত্যিইতো সে অপরাধ করছে। কী দরকার ছিল তার নিজে জল ঢালতে যাওয়ার। বাহাদুরী দেখানর। ঠিকই হয়েছে তার।

সে তার ছেলের বউকে বলতে শুনলো, 'বুঢ়া হিলে কি মানুষের পরখিত ছাড়া ধরে। কত লোক আর ও কত কম বয়সে মরি যায়টে, এ বুড়োর মরণ নাই। খালি থালা থালা খায়টে, আর যউটা ক্ষতি হবে সউটা করতে যাওয়া। আবার বুড়া বয়সে কিনা দেখার শখ। হাসপাতাল যাওয়া হিথলা কারো কথা নাই মানিকি। আর অতবা এঠি আইসিকি দেখনা কি রকম মরেটে। আমার অত সাধের কলসীটা......'

দুখীরাম দাওয়া থেকে নেমে এল বাইরে। হঠাৎ তার চারিদিকটা অত গরম হয়ে উঠল কেন? তার সারা গায়ে কি আগুন ধরে গেছে? বড় জ্বালা বুকটার ভেতর। সে যেন একদম অন্ধ হয়ে গেছে। চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে সে টলতে লাগলো। চার পা দূরে বোসেদের পুকুরটায় পোঁছতেই তার মনে হলো সে যেন কোন সুদূর থেকে হেঁটে এল। অনন্তকাল ধরে পথ চলছে। সে হামাগুড়ি দিয়ে নামল জলে। এই বড় পুকুরটার জল তো বোশেখেও হিম ঠান্ডা থাকে, তবে আজ এত গরম ক্যান? কই, চার কুড়ি বছরের শরীরটা তো ঠান্ডা হচ্ছে না। সে মোষের মত গলা পর্যন্ত জলে ডুবে বসে থাকল। সত্যিই তো তার এত বয়সেও দ্যাখার শখ! এখনও শোনার শখ! বাঁচার শখ! এত শখ কেন তার বুকে? বোশেখের কড়কড়ে তাপ তার ক্ষয়ে আসা পাঁজরের ভেতর ঢুকে যেতে লাগলো। পুড়ে যেতে লাগলো তার যাবতীয় শখ। অদৃশ্য কাউকে কিংবা হয়তো নিজেকেই শুনিয়ে দুখীরাম বিড় বিড় করে বলল, 'অউ চারকুড়ি বয়সে মরণ বড় ভালোহে, মরণ বড় ভালো।'

# শিল্পী

আমাদের বাড়ীর সামনেই ছিল একটা ফাঁকা মাঠ। বিকেলে পাড়ার ছেলেরা খেলতো ওখানে। ঐ মাঠ ছাড়িয়ে আরো সামনে ছিল কতগুলো হিজিবিজি গাছের জঙ্গল। ওদিকটা বেশ নিরিবিলি। মাঝে মাঝে সেই ঝোপঝাড় পেরিয়ে ওর ওপাশের একটুকরো ঘেসো জমিতে গিয়ে আমার আগামী গল্পের প্লট ভাবতাম। সেখানেই হঠাৎ দেখা পাই লোকটার। একটা ক্যানভাসের অসম্পূর্ণ ছবির সামনে অদ্ভুত ভঙ্গিতে চুপচাপ বসেছিল সে। কী যেন ছিল লোকটার মধ্যে আমি এড়িয়ে যেতে চেয়েও পারিনি। ওর সেই আধপাগলা পোষাক, চোখের তন্ময়তা আমাকে তার কাছে টেনে নিয়ে গেল। তারপর ক্রমশ আরো কাছে।

কারো সাথে খুব একটা মিশত না সে। তবে কেন কি জানি মাঝে মাঝে আমার কাছে আসতে শুরু করল। গল্প-টল্প করত। ওর নিজের কথা, ওর ছবির কথা। কথা বলতে বলতে সে যেন কোনো এক স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছে যেত। আর ঠিক সেই রকম ছিল তার ছবিগুলো। চারপাশের প্রকৃতি যে এত সুন্দর, তা বোধ হয় ওর ছবি না দেখলে আমি কোনো দিন জানতেও পারতাম না। কোন নতুন ছবি আঁকলেই সে আমাকে দেখাতে আনত। আর প্রতিবারেই আমাকে ছবিটা দিয়ে শিশুর মতো চোখ মেলে এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকত। আমি মুখ তুললেই ও জিজ্ঞাসা করত, 'ভালো হয় নি?' আমি বলতাম 'অপূর্ব'।' বাস্তবিকই এত সুন্দর, এত বাস্তব ছবি তার আগে কখনো দেখিনি। দেখতাম ওর গর্তে বসা চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করে বসন্তের কোকিলের মতো হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। কোন গভীর সমুদ্রের অতলে চলে যেত সে। এক সময় শুনতে পেতাম যেন বহুদূরের কোন এক জগৎ থেকে সে বলছে, 'জানেন, কিছুতেই পারি না। বহুদিন হলো চেষ্টা করছি, তবু একটা ছবি আমি কিছুতেই পারছি না।' আমি তার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারতাম না। লোকটার

এত সুন্দর হাত অথচ সে ছবিটা আঁকতে পারছে না। ক্যামন ছবি ওটা ?

এই কিছুক্ষণ আগে সে এসেছিল আমার কাছে। তার সারা মুখ থেকে আনন্দ খেজুরের রসের মতো চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঝরছিল। আমি বললাম, 'কি ব্যাপার, খুব খুশী খুশী ভাব যে ?' সে বলল, 'খুশী হব না। আজ যে আমি সফল হয়েছি। এই দেখুন না আপনি। সে ওর বগলদাবা ক্যানভাসটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি ওটা হাতে নিয়েই চোখ বসালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলাম। একি! এ যে একটা মানুষের সুন্দর ধড়ের ওপর অদ্ভুত ধরনের মাথা। মানুষের মতো হলেও ঠিক যেন মানুষ নয়। অনেকটা চিতার মতো: চোয়ালের দু'পাশ দিয়ে ডগডগে লাল রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আর এসব কিছু ছাড়িয়ে সবচেয়ে যেটা বেশী আকর্ষণ করে সেটা ওর দু'টো চোখ। বেশীক্ষণ তাকানো যায় না ঐ দৃষ্টির দিকে—অসহ্য তাপে ঝলসে যায় সারা শরীর। এত লোভ, এত হিংস্রতা, এত ক্রুরতা! আমি যেন এক অন্ধকার অরণ্যের দিকে চলে যেতে লাগলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমি কাঁপছি। আমার ফ্যাকাসে চোখ দুটো দিয়ে ওর দিকে চাইলাম। শিল্পী সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ভালো হয়নি ছবিটা ?'

# তিনজন যীশু

আকাশ ঝরছিল টিপটিপিয়ে, তারপর টপ্‌টপিয়ে, অবশেষে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। তিনজন রাস্তার মানুষ তাদের সংসারটাকে বুকে চেপে ধরে দৌড়ে গেল সামনের চারতলা বাড়িটার দিকে। গেটে নিষেধ ছিল না। বারান্দা ও শুনশান্‌। এ-ওর চোখে চোখ রাখল। ঝকঝকে বারান্দা—আলো ফেরায়। কালো কালো ফোঁটা জল ওদের পায়ের কাছে। কি সব হিজিবিজি নক্সা হয়ে যায়। রাস্তার নক্সা। এটা আয়না বারান্দা। তিনজন কেঁপে কেঁপে ওঠে। জরিপ করে নিজেকে, জরিপ করে বারান্দা। কাঁপন বাড়ে, উঁকি মারে এদিক ওদিক। কিন্তু বারান্দা শুনশান্‌। চোখে মেঘ সরে, রোদ ফোটে। তিনজন এককোনে সংসার সাজায়। ছোটটি মায়ের বুকে মুখ গোঁজে। তারপর কাঠবেড়ালীর মতো কিচ্‌ কিচ্‌ করে ছোটে এদিক ওদিক। বাচ্চাওয়ালা মুরগীর মতো মায়ের দৃষ্টি ওর পেছু পেছু। বাপ বৃষ্টি দেখে আর তিনজনের পেট। নিঃশব্দে শাপান্ত করে ইন্দ্রকে। এমন সময় হোঁচট লাগল কচি পায়ে। বাতাস কাঁপল, মা ছুটে গিয়ে তাকে টেনে নিল বুকে। 'চুপ চুপ।'

ওপরে প্রচন্ড হুংকার—ঘেউ···ঘেউ···ঘেউ...। বড় দুজন তখন খরগোশ, খরগোশ। কান খাড়া, বুক ঢিপ ঢিপ, ক্যাঁচ করে খুলল দরজা। সিঁড়িতে ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ। কচিটিও চুপ। তিনজন মাছের দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল সিঁড়ির দিকে। ওপরের মানুষটি সিঁড়ির মুখে স্থির। বারান্দায় কালো আল্‌পনা। তাঁর আগুন আগুন চোখ। বড় দু'জন প্রার্থণায় নতজানু। কিন্তু তবু তাঁর সারা শরীর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ক্রমশ তাঁর সারা শরীরে ফুটে উঠল কালো হলুদ ডোরা। তিনি ধারালো নখরওয়ালা থাবা উঁচিয়ে হুংকার ছাড়লেন।

ওরা তিনজন আবার পথে নেমে এল। সারা আকাশ ভেঙে পড়ল ওদের মাথার ওপর। ওরা আকাশের দিকে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'না-না-না।' আকাশ থামল না।

কিন্তু তবু ওদের হাত আকাশের দিকেই উঠে রইল। তিনজন মানুষ আকাশের দিকে হাত তুলে স্থির—ঠিক যীশুর মতন।

## মালিকানা

হারু দলুই মালিকের কথা অগ্রাহ্য করলে। হলদী পুকুরের পাশে এক বিঘের জমিটাতে ধান রুইল সে। তার ঠাকুরদার সময় থেকে ভাগে চষা জমি সে আজ ছাড়বে কেন? আদালতকে আর ডরায় না। একথা নাকি সে গাঁয়ের পাঁচজনের কাছে বলে বেড়াচ্ছে।

রাধাকান্ত সাউ মশায় ও ছাড়বেন কেন? তাঁর হক্কের জমি। তুই কুকুর হয়ে কি না মাথায় চাপবি! তিনি সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হতেই মদনা সাঁওতালের বাড়িতে ঢুকলেন পা টিপে টিপে। নগদ দু'বোতলের দাম, কাজ হাসিল হলে আরও পঁচাশ—এই কড়ার হলো। তিনি অন্ধকারে বাতাসকে শুনিয়ে বললেন—হুঁ-হুঁ, এবার?

ভোরে উঠেই রাধাকান্তবাবু তাঁর প্রিয় ছড়িটা হাতে নিয়ে মাঠের দিকে এগুলেন। অনেক দিন পর 'শ্যামা মায়ের চরণ তলে' গুন গুন করে গাইতে বড় ভালো লাগছিল তাঁর।

সারা জমিটাতে ঘোলাটে জল। আলের উপর থেকে দৃশ্যটা দেখতে দেখতে রাধাকান্ত বাবু খুশীতে ডগমগ।

হঠাৎ তাঁর নজর পড়ল পুবের কোনটাতে। সেখানে এখনো কিছুটা জমিন জুড়ে কি করে যেন সবুজ। তিনি ছুটে গেলেন সেদিকে। গাছগুলো গলা জলে দুলে দুলে নাচছিল আর মুচকি মুচকি হাসছিল। রাধাকান্তবাবুর সারা শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিল সে হাসি।

তিনি গর্জে উঠলেন, 'চোপ্, বেয়াদপের দল। আসল আর নকল মালিক চিনিস না?'

# কবির অসুখ

অন্ধকারের ও এক দ্যুতি আছে, নীরবতারও আছে এক অপূর্ব সুর। তবে সে দ্যুতি চোখে নয় চোখের মণি ছাড়িয়ে প্রতিবিম্ব ফেলে বুকের গভীরে, সেই সুর কান ছাড়িয়ে মনের ভেতর জাগায় তন্ময়তা। নীলাঞ্জন এমনি এক আলোকের ছটায়, এমনি এক সুরের আবেশে নিজেকে ডুবিয়ে দিচ্ছিল চেতন থেকে অচেতনতার জগতে। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানির মত সব কিছু ছাড়িয়ে তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো কতকগুলো দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া বীভৎস শব্দ। সহসা এমনি সব শাব্দিক অসুরেরা অপবিত্র করে তার মানস যজ্ঞকে। নীলাঞ্জন বুঝি আগে থেকেই টের পাচ্ছিল এমনি হবে। এ রকমই হয়। কেন যে সে নিজেকে আনন্দের মধ্যে, গভীর সুখের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে পারে না। হঠাৎ হঠাৎ এমনি সব বীভৎসতা তাকে ভেঙে চুরে দিয়ে যায়। এই যে সে এখন দেখছে তার চারপাশে ঘিরে অগনন শব্দ—ভাংগা ধ্বংস প্রায় কুৎসিত সব শব্দ, সেই আলোক ছাড়িয়ে সেই সুর ছাড়িয়ে হঠাৎ ভেসে উঠল এরা। ঠিক যেন নারীর পরিপাটী করে আবৃত দেহবল্লরীর অপরূপ রূপকে সরিয়ে কেউ যেন তার উলংগ শরীরের কুৎসিত রূপকে দু' চোখের সামনে মেলে ধরল। এমনি এক গা গুলোনো, ঘৃণ্য নগ্নতা। কেন? কেন এরকম হয় তার? সে তো চায় বহতা নদীর গানের মতো অনুক্ষণ বয়ে যাক শব্দের সুরেলা স্রোত। তাইতো সে পিতৃত্বের মায়ায় একটি একটি করে সুন্দর শব্দগুলোকে সাজিয়ে রাখতে চায় তার কবিতার মধ্যে। কিন্তু তবু কেন মাঝে এমনি সব ভয়ংকর ঘটনা ঘটে। নগ্ন হয় শব্দের শরীর—ঘেয়োরুগী শব্দেরা দুর্গন্ধ ছড়ায়। সে যে সহ্য করতে পারে না। মাথার ভেতর হাতুড়ী পিটতে থাকে কোন এক অদৃশ্য মানুষ। প্রচণ্ড উত্তাপ ছড়িয়ে যায় সারা দেহে। সে যেন কোথায় হারিয়ে যেতে থাকে, কারা এমন নিষ্ঠুরের মত শব্দকে ভাংগে! শব্দকে ধ্বংস করে নির্লজ্জের মত!

শব্দ যে ব্রহ্ম, আর ব্রহ্ম যে সুন্দর, আর সেই সুন্দর ছাড়া যে মানুষের বুকের ভেতরে আর কারোরই স্থান হতে পারে না। এই সহজ সত্যটাকেই সবাই হেসে উড়িয়ে দিতে চাইছে তার বক্তব্য না শুনেই। এসব ভাবাই নাকি অসুস্থতার লক্ষণ। তার নাকি অসুখ? সে নাকি অবাস্তব সব ব্যাপার কল্পনা করছে। সুস্থ করে তোলা হচ্ছে তাকে। না, সে আর কিছুতেই ওদের কথা শুনবে না। শুনলে চলবে না। যতসব পাগলের দল জুটেছে তার কপালে। নিজেদের নির্বুদ্ধিতা চাপা দিতে চাইছে তার উপর গলার জোর খাটিয়ে।

সে বিছানা ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করতেই তার মা বললেন, "কিরে নীলু, আবার উঠছিস্ কেন? শুয়ে পড়, শুয়ে পড়, এখন উঠিস না।" তার বুকে হাত দিয়ে শুইয়ে দিতে চাইলেন। "মাথা যন্ত্রণা করছে? মাথাটা টিপে দেই তাহলে। দেখবি ক্যামন আরাম লাগবে। নে শুয়ে পড়।" নীলাঞ্জন মায়ের হাত ছাড়িয়ে বসে রইল।

"না, কিছুতেই আর তোমরা শুইয়ে রাখতে পারবে না আমাকে। তুমিও শেষে ওদের মতো হলে। আমার কোন অসুখ করেনি—করেনি—করেনি। অসুখ করেছে ওই ওদের যারা আমাকে শুধু শুধু শুইয়ে রেখেছে। চিকিৎসা করাও ওদের—তোমার বড় ছেলে, আর মেজো ছেলের। তোমরা কেন বোঝ না এমনি এসব অসামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দের মধ্যে শুয়ে থাকা যায় না। এই দেখ এই যে আমার সামনে যে শব্দটা পড়ে রয়েছে, 'তুমি তোমার মাকে খেয়েছো' এ রকম্ শব্দ যদি চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়, তাহলে শুয়ে থাকা যায়? আমি কি তোমাকে খেয়েছি? মানুষ কি মানুষকে খেতে পারে? কোন সন্তান কি মাকে ভক্ষণ করতে পারে? তবে কেন ঐ বেঢপ শব্দটাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিব না? কেন আমি এমনি সব নোংরা শব্দের মাঝে চুপচাপ শুয়ে থাকব? কেন নতুন করে সমস্ত শব্দগুলোকে সাজাব না?"

—"আঃ তুই চুপ কর, শুয়ে থাক।"

—"না, তোমাকে আজ বলতেই হবে। শব্দকে সুন্দর করে সাজানো কি দোষের? বিষাক্ত শব্দ সব নেচে বেড়াচ্ছে দেখেও যারা স্বাভাবিক ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা অসুস্থ, না আমি? বল, তোমাকে বলতেই হবে। বল—বল, কোনটা ঠিক? আমি অসুস্থ—আমি পাগল, বল—বল—বল।"

হঠাৎ নীলাঞ্জনের মাথার ভেতরটায় যেন আগুন জ্বলে ওঠে। কি যেন তার

হয়ে যায়। মাকে দুহাতে ধরে ঝাঁকাতে থাকে। ঝাঁকাতেই থাকে।

পাশের ঘর থেকে ছুটে আসে সবাই। তার বড়দা, মেজদা, তার বোন আর বৌদিরা। বড়দা গর্জে ওঠেন, "আবার খ্যাপামী শুরু করেছিস? ছাড় ছাড় মাকে। তোকে না চুপচাপ শুয়ে থাকতে বলা হয়েছে। ওরকম চিৎকার করছিস কেন? দীপু, ট্যাবলেটটা নিয়ে আয় তো, দেখি ও কত গুন্ডামী করে।"

নীলাঞ্জন জানে ওরা ওকে ওই ট্যাবলেটটা খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়। ওর স্নায়ুগুলোকে অবশ করে দিতে চায় যাতে সে শবগুলোকে বেছে বেছে সুন্দর করে সাজিয়ে দিতে না পারে। এই সুন্দর শবের মাঝে তারা বেমানান না হয়ে যায়। কিন্তু আজ সে কিছুতেই ওদের ফাঁদে ধরা দেবে না—কিছুতেই সে ট্যাবলেটটা খাবে না।

সে চিৎকার করে, "না, আনিস না মেজদা। আমি কিছুতেই ওষুধ খাব না।"

"নিয়ে আয় তুই, দেখি সে ক্যামন না খায়।"

নীলাঞ্জন হাত পা ছুঁড়ে ওদের দূরে হটিয়ে দিতে চাইল। ঝন্ ঝন্ করে কাচের গ্লাসটা ভেঙে গেল। মরীয়া হয়ে উঠল সে। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে পড়ে রইল। কিন্তু কিছুতেই ওদের সাথে পেরে উঠল না। জোর করে ওরা তার কণ্ঠনালীর ভেতর ঠেলে দিল ট্যাবলেটটা। সে ক্ষোভে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। মায়ের আঙুল ওর মাথার চুলের ভেতর ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে হাত দিয়ে তাঁর হাতটাকে সরিয়ে দিতে চাইল, পারল না। হাত দুটো যেন অনেক ভারী হয়ে গেছে। বলতে চাইল, "কই আমাকে তোমার আদর রক্ষা করতে পারল ওদের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে!" জিভটাও যেন ক্রমশ অসাড় হয়ে আসছে। কেউই আর মস্তিষ্কের আদেশ মানতে চাইছে না। সে বুঝতে পারছিল চোখের ভেতরটা ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে গলে গলে ঝরে পড়ছে। চোখের পাতা দুটো ক্রমশঃ ভারী হয়ে চেপে বসতে চাইছে চোখের মণির উপর। তার চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে। তার শরীরটাকে চারপাশের দলা-পাকানো শবের মাঝখানে ফেলে রেখে। শবেরা ছড়িয়ে যাবে অনবরত বিষাক্ত বাতাস। নাকের ভেতর দিয়ে ছড়িয়ে যাবে মানুষের রক্তের ভেতরে। অথচ সে বিকল হয়ে পড়ে রইবে—কিছুই করতে পারবে না। ওরা কি সবাই বুঝতে পারছে ওদের শরীরেও ঢুকে যাচ্ছে শবের বিষ। ওরাও এগিয়ে চলেছে

মৃত্যুর দিকে একপা একপা করে। অথচ তাকে…কে যেন বলছে,—"শুয়ে থাক কিছুক্ষণ…ওসব…পাগলামী·· ঠান্ডা হয়ে যাবে…" সে যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে…কোথায়…শুধু নির্জন প্রান্তর···শূন্যতা…সে যেন কে…সে যেন কি চায়···আঃ মা গো…।

নিঝুম নিস্তব্ধতার মধ্যে ধীরে ধীরে চোখ মেলে নীলাঞ্জন। ঝিরঝিরে বাতাস স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় মিশে জানালা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘর—তার সারা শরীর···শরীর ছাড়িয়ে বুকের মধ্যে। স্বপ্নালু আবেশ সে বাতাসে, মধুর স্নিগ্ধতা সে চাঁদনীতে। সমস্ত শব্দরা গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে, যেমন ঘুমিয়ে আছে এই বাড়ীটা। শুধু নীরব আহ্বান বাইরের প্রকৃতির। কিছুতেই আটকে থাকতে চায় না মন এই ঘরের বন্ধতার মধ্যে। বাইরের অফুরন্ত সমারোহ যেন তার জন্য—কেবল তারই জন্য, অথচ সে……। নীলাঞ্জন উঠে দাঁড়ায়। পাশের বিছানায় মায়ের নিদ্রিত ভাঙা চোরা সংসারী শরীর ঘুমে অচেতন। মায়ের জন্য তার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, যেভাবে প্রায়ই সে এই অনুভূতিটা পায়। সে জানে কেউ না বুঝলেও মায়ের মনটায় যে দুঃখ কষ্ট বোধগুলি তাকে ঘিরে রয়েছে তার প্রতিবিম্ব পড়ে। সে কি কোনদিন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না তাঁর চোখের সামনে থেকে। হয়তো কোন সন্তানই তা পারে না। সে বলতে চাইলো, "জানো মা, আমিও তোমার বুকের গভীরের লেখাগুলো পড়তে পারি। আর পারি বলেই পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখের শব্দগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে সুখের করে দিতে চাই। অথচ ওরা আমাকে অসুস্থ বানিয়েছে। মা, সত্যি করে বলোতো তুমি ও কি তাই ভাবো?"

সে পা টিপে টিপে বাইরে বেরিয়ে এসে বুক ভরে গভীর ভাবে টেনে নেয় এই রাতের শীতল বাতাস। চাঁদের আলোয় নাইতে থাকে অবিরত—ঠিক যেভাবে তাদের উঠোনের বুড়ো আমগাছটা উদোম হয়ে ডুবে আছে জোৎস্নায়। বড় ভালো লাগে নীলাঞ্জনের। বহু মূল্যের এই ভালোলাগাটাকে যেন অনেক অনেকক্ষণ ধরে রাখতে পারে, তাই একটু একটু করে উপভোগ করতে থাকে। মাথাটা তার বেশ হালকা হয়ে আসছে। ঘাসের উপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে। ঈষৎ শিশির ভেজা ঘাসের শীতলতা উঠে আসে ওর বুকে। সে চেয়ে থাকে সাদা সিল্কের মেঘের ওড়না ঢাকা চাঁদের দিকে। চেয়ে থাকে—চেয়ে চেয়ে—অপলক। হঠাৎ চাঁদটা বদলাতে শুরু করে। একি! এতো চাঁদ নয়, একটা মুখ। চাঁপার

মত হলদেটে মুখ যেন চেয়ে আছে তার দিকে। বড় চেনা, বড় পরিচিত সেই দৃষ্টি। বড় টানা চোখের ভেতর অস্থির কালো মণি। অল্প কোঁকড়ানো কালো চুল কাঁধ পর্য্যন্ত নেমে এসে হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। বাঁকানো কালো ভ্রু-র প্রতিমার মত লম্বাটে মুখ। আলতো হাসি ঝরিয়ে সেই মুখ চেয়ে আছে। যেন ভোরের শিউলি ঝরে পড়ছে টুপ টুপ করে। নীলাঞ্জন ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে "কবিতা, তুমি!" বুকের ভেতরটা তার চিন চিন করে ওঠে। ইচ্ছে করে সারাক্ষণ চেয়ে থাকে ওই মুখের দিকে। কিন্তু তবু জোর করে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখে অন্য দিকে। কেন চাইবে? ও মায়াবী মুখতো শুধু ব্যাথা দিতে জানে— নিষ্ঠুর তুমি নির্ম্মম কবিতা। না, সে কিছুতেই চাইবে না ওর দিকে—কিছুতেই না। তবু ওর অজ্ঞাতেই সে আবার চায় চাঁদের দিকে। এখনও সেই মুখ চেয়ে আছে তার দিকে। চোখের তারায় ভাষা, ঠোঁটে কম্পন। কিন্তু সে জানে এর আড়ালে আরও এক অন্য মুখ লুকিয়ে আছে, সে সাপের মত বিষের ছোবল দিতে জানে। নীলাঞ্জনের শিরায় উষ্ণ স্রোত বইতে থাকে। তার ইচ্ছে করে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে ওর নরম গলাটাকে টিপে ধরে শক্ত করে। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করে তার, "কেন? কেন? তুমি আস বার বার? অঢেল ঐশ্বর্য্যের কামনা পুষেছিলে বুকের মধ্যে, তাইতো পেয়েছো। তবে কেন এই নীলাঞ্জনকে ব্যাথা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারো না মাঝে মাঝে। যাও...সরে যাও সামনে থেকে। আমি তোমাকে ঘৃণা করি, শোন কবিতা, ভালো করে শোন, আমি তোমাকে ঘৃণা করি।" নিঃশব্দে নীলাঞ্জন ছুঁড়ে দেয় নিজের ঘৃণা আকাশের দিকে, চাঁদের দিকে।

মাথাটা ক্রমশঃ ভারী হয়ে আসে তার। বুকের ভেতর ফের যন্ত্রণাটা টের পায়। সব যেন গুলিয়ে যায়। বিকৃত শব্দগুলো নড়ে ওঠার শব্দ পায় সে— এই এক্ষুনি যেন জেগে উঠবে। নীলাঞ্জন ভয় পায়। ছুটে পালিয়ে আসে। ঘরে এসে শক্ত করে কপাটের খিল এঁটে দেয়। কেউ হয়তো ঘরের ভেতর ঢুকে পড়তে পারে। ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাথার রগ দুটো টিপে রাখে। কি ভেবে আবার উঠে দাঁড়ায়। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে কাগজ আর কলম নিয়ে বসে। কিছুক্ষণ ভাবে, ক্রমশ কলম শক্ত হয়ে আসে হাতের মধ্যে।

"একটা মুখ রোজ ভেসে আসে স্বপ্নের মধ্যে,

মনের মধ্যে তোলপাড় করে একা একা—
সারারাত কি এক চঞ্চলতায় শরীর শিউরে উঠে
চেনামুখ অচেনায় ঢেকে থাকে সারারাত।
গহন নীলিমায় আকাশের তারায় তারায়
একা একা তোলপাড় হয় মনের গহন প্রদেশে।
তবে কি অসতে পারে সেই চেনা সুখ ?
সেই চেনা জানা দিন অস্পষ্ট অতীত
হাতছানি দেয় ভবিষ্যতের ঈশারায় ?
তুমি জান না—
শেষ রাতের হিমেল স্পর্শে সেই মুখ
কাছে, আরও কাছে চরম বিহ্বলতায়
শেষ রাতের সুরে বেজে ওঠে,
তুমি জান না—
স্বপ্নে রোজ তোমার মুখ ভেসে আসে
চরম নিষ্ঠুরতায।"

নীলাঞ্জন চেয়ে থাকে নিজের লেখা অক্ষরগুলোর দিকে। কতক্ষণ চেয়ে থাকে খেয়াল থাকে না কিছুই। তার মায়ের ঘুম ভেঙে যাওয়া, তার কাছে উঠে আসা—কিছুই টের পায় না সে।

"কিরে, রাত জেগে জেগে আবার কি লিখছিস ? তোকে না ডাক্তার এখন লেখালেখি করতে বারণ করেছেন।...শুয়ে পড়।...খাবি কিছু ? সেই বিকেল থেকে তো খাসনি। একটু বোস, নিয়ে আসছি আমি।"

নীলাঞ্জন একটি কথাও বলে না। চিৎ হয়ে পড়ে থাকে। কাগজটাকে মুচড়ে মুঠো করে চোখের ওপর ধরে রাখে। চোখ খোলে না কিছুতেই। সে বুঝতে পারে তার চুলের মধ্যে তার মায়ের আঙুলগুলো গভীর মমতায় খেলে বেড়াচ্ছে। চোখদুটো তার জ্বালা করতে থাকে। তার মা বলেন, "জানিস নীলু তোর বাবা যাওয়ার সময় বলেছিলেন,—নীলুকে লক্ষ্য রেখো। বড় ভাবুক প্রকৃতির ছেলে। দ্যাখনি কেমন বাইরের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে বসে থাকে। আমার মতো উড়ু উড়ু মন, ভয় হয়, সেও না কবিতা লিখতে শুরু করে। ওতে বড় কষ্ট, বড় যন্ত্রণা। ও যেন এই কষ্ট না ভোগ করে।"

নীলাঞ্জন জানে, তার বাবা তাঁর হ্রস্ব জীবনে কবিতা লেখা ছাড়া আর কিছুই করেন নি। সে মাঝে মাঝে তার বাবার কবিতাগুলোর পাণ্ডুলিপি খুলে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে তার ভেতর। সে যেন বাবার অনেক কাছাকাছি পৌঁছে যেত, তাঁর বুকের শব্দ কান পেতে শুনত কবিতার মধ্যে। মনে হতো তার বাবা তার কাছে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বাবার জন্য একটা ছোট্ট কুঠরী তার বুকের মধ্যে রয়ে গেছে—যেখানে সে জমিয়ে রেখেছে তার বেদনা। আর তীব্র ক্ষোভে সে তার হাত দুটোকে মুঠি বদ্ধ করত—প্রত্যয়ে অনড়।

অথচ এখন সব ক্যামন বিবর্ণ হয়ে গেছে। চারদিক থেকে কারা যেন ফিসফিসিয়ে ওঠে। তাকে দেখে হেসে ওঠে বাতাস কাঁপিয়ে। বিকৃত শব্দ সব তাকে ঘিরে নাচতে থাকে। সে মরীয়া হয়ে ওঠে। হাতের আঙুলগুলো দিয়ে শক্ত করে কলমটাকে চেপে ধরে কাগজের ওপর। চিৎকার করে বলে উঠতে চায়, "তোমরা সত্য নও। সত্য আমার কবিতা।" আর তখনই মনে হয় এখন আর একটি লম্বাটে মুখ তার টানা বড় চোখ নিয়ে গভীর মমতায় চেয়ে থাকে না তার কবিতার ওপর। তাকে উৎসাহ জোগায় না, স্বপ্ন দেখায় না—সেই রঙীন স্বপ্নটা, যার সৌরভ শরতের সকালের মতো। স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা আর নীচতার নগ্নরূপ দেখিয়ে সরে গেছে বহুদূরে। ভালো লাগে না কিছু তার। এখন বড় কষ্ট বুকের ভেতর। ওই যে শব্দগুলো মাঝে মাঝে নড়ে চড়ে উঠছে, ওকে গিলে ফেলতে চাইছে। কিছুতেই সে তাদের বহতা নদীর গানের মতো করে দিতে পারছে না। এই যে তার মা রাত জেগে তার চুলের ভেতর গভীর মমতায় বিলি কাটছেন, তাঁর জন্য নীলাঞ্জনের মাঝে মাঝে কষ্ট হয়। সে কষ্ট দিচ্ছে তাঁকে। তাঁর বাবা সারা জীবন ধরে কষ্ট দিয়েছেন তাঁকে। তবে কি সে তাঁকে অনবরত খেয়ে চলেছে? একথা কি ঠিক? ঐ জ্বলজ্বলে শব্দটা! কিন্তু সে তো চেষ্টা করে চলেছে। এই সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও সে স্থির অবিচল তার লক্ষ্যে। তবে কেন ঐ শব্দটা? সে সব ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে। পাথরের মতো শব্দকে ভেঙে নতুন শব্দ তৈরি করবে—তার প্রিয় শব্দ সব।

কলমটা দিয়ে কাগজের ওপর অক্ষর টেনে শব্দ সাজাতে ইচ্ছে করে তার! কপালের ওপর মায়ের আঙুলের শীতলতা তার সমস্ত দুঃখকে শুষে নিতে চায়,

সব—সব। নীলাঞ্জন শুয়ে থাকে চুপচাপ—শুধু শুয়ে থাকা—কিছুতেই মায়ের অনুরোধেও খেতে পারে না কিছুই।

প্রথম প্রথম নীলাঞ্জনের চার পাশে ভীড় করত এ-ও। ওদের কৌতূহলী চোখ তন্ন তন্ন করে তাকে তল্লাসী করত। বন্ধু-বান্ধবরা আসত, ওকে সঙ্গ দিয়ে ওর জগৎ থেকে ছিনিয়ে ওদের জগতে নিয়ে যেতে চাইত। ওদের চোখে ঝরত করুণার দৃষ্টি। ওরা তাকে করুণা করতে চায়। আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব ওকে করুণা করতে চায়। সে তাদের কাছে কৃপার পাত্র। সে ব্যর্থ-অসহায়, পরাজিত—ওর মাথার মধ্যে এমনি সব শব্দ চিৎকার করে উত্তেজিত করে তুলত। সে পথে বেরুলেই মনে হতো সমস্ত মানুষ তাদের দৃষ্টি দিয়ে তাকে লেহন করছে! ওরা যেন বলছে, "ওই দেখ—ঐ যে নীলাঞ্জন যাচ্ছে। ঐ দেখ, ওর চোখগুলো ক্যামন হতাশায় ম্লান। ও নাকি কবি! ওর কবিতা কেউ পড়ে না। ও না কি শিক্ষিত! ওর কোন কর্মসংস্থান নাই। ও নাকি প্রেমিক! ওকে কবিতা ছুঁড়ে দিয়েছে তার জগৎ থেকে। ও নাকি আদর্শবান যুবক! ওর আদর্শ ওকে পৌঁছে দিয়েছে আজকের এই এখানে। হাঃ—হাঃ—হাঃ—দেখ, সবাই ওকে দেখ, যতো পারো হেসে নাও। এই যে নীলাঞ্জন পালাচ্ছে—ঐ যে কবি পালাচ্ছে—ঐ যে প্রেমিক পালাচ্ছে—ঐ যে শিক্ষিত যুবক পালাচ্ছে।" নীলাঞ্জন দু'হাতে কান দুটোকে চেপে রেখে ছুটে পালাত। দূরে—ওদের কাছ থেকে দূরে—অনেক দূরে। এক তীব্র আক্রোশে শুধু ফুঁসতো। ক্রোধে দাঁতে দাঁত চেপে নীরব যুদ্ধ ঘোষণা করত ওদের বিরুদ্ধে। সারা বুকময় যন্ত্রণা নিয়ে কখনো বা নিজেকে যীশু ভাববার চেষ্টা করত। ক্রমে ক্রমে সব গা সওয়া হয়ে এল। নিজের গন্ডীকে ছোট্ট করে নিয়ে এসেছে নিজের চারপাশে। বন্ধু-বান্ধবরা আসে আরও অনিয়মিতভাবে। ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় ওর সেই আগের জগতে। সে কিছুই বলে না, ঈষৎ হাসে। যেন বলতে চায় "এইতো বেশ আছি। প্রকৃতি কত সুন্দর। গাছপালা, ফুলফল, পশুপাখি সবাই ক্যামন সুখ ছড়ায় পৃথিবীর বুকে। বড় গভীর সে সুখ··· নিষ্পাপ নির্জন···সে তাদের শোনায়ঃ—

"শাব্দিক বাতাসে আজও কিছু স্মৃতি জড়িয়ে থাকে
বনানী নির্জনে ;
নিশিক্ত শিহরণ কাছে ডাকে

যেখানে বনানী সৌরভের পিছুটান
নীলাভ নির্জনে।
আসলে এ শাব্দিক বাতাসে
প্রাণময় বানাণী সৌরভ
নিষ্পাপ মিতালী ছড়ায়
নীলাভ নির্জনে।"

মাঝে মাঝে নীলাঞ্জনের মনে হয় কোথাও চলে যায় অনেক দূরে কোথাও—যেখানে সে নীরবে সাজিয়ে যেতে পারে শব্দের পর শব্দ। এখানে তো তাকে কেউ শান্তিতে থাকতে দেবে না। ওর নাকি অসুখ করেছে। ওকে সবাই ভালো করে তুলতে চায়—সুস্থ, স্বাভাবিক, গৃহস্থ সংসারী অর্থাৎ বিয়ে-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, কর্মময় জীবন, ভরপুর সামাজিক মানুষ! হাঃ—হাঃ—কি বোকা সব, ওরা জানে না চারদিকের আহত শব্দগুলোর ঘা সব ক্যামন বিষিয়ে উঠেছে। পচা, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। চারদিকে নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। মানুষ ধুঁকছে এই সব বিকৃত গলিত শব্দের মধ্যে একটু নির্জন বাতাসের জন্য। আর তাকে হতে হবে সংসারী মানুষ! ওদের মতো অসুস্থ ভারবাহী পশু। শুধু গড়িয়ে যাও ...গড়িয়ে···গড়িয়ে···একই পথে বার বার...অনবরত...।

তাব ভালো লাগে না মোটেই দিনরাত নিষেধ আর নিষেধ। বিশ্রাম নাও। বেশী বই পড় না। বেশী লেখালেখি কর না। ভালো ভালো খাও। ঘুমাও, টোটাল বিশ্রাম। সে শুধু মায়ের কথা ভেবে, তাঁর সেই ভেজা কালো মণির দিকে তাকিয়ে ওদের মতে উঠছে আর বসছে। কিন্তু আর নয়। আর ওদের এই কারাগারে নয়। উন্মুক্ত জগৎ—নীল সমুদ্র, সবুজ বনানী কিংবা তুষার পর্ব্বত। কিন্তু ওই শব্দগুলো? ওকে যে অনবরত তাড়া করে ফিরছে। ওকে ঘিরে রেখেছে অতন্দ্র প্রহরায়—ওরা ও যদি ওর সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে যায়? ওর কি মুক্তি নেই। সেই মুখ? সেই ঈষৎ লম্বাটে বড় টানা চোখের মুখ? সেও যদি···। মাথাটা শুধু গরম হয়ে ওঠে। তীব্র গর্জনে ওদের দিকে ধেয়ে গিয়ে দু'হাতে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে সব তছনছ করে দিতে চায়। এই তো সব বিকৃত শব্দগুলো ক্যামন মরীয়া হয়ে একযোগে ধেয়ে আসছে তার দিকে। ওই তো, অজস্র শব্দ—শব্দের মিছিল—'ধর শালাকে', 'মার', 'শালার কবিপনা বার করছি এক্ষুনি', 'তার মাকে খাচ্ছে', 'কবিতাকে নিয়ে নষ্টামি করতে চেয়েছিল,' 'মার-মার',

'কেটে ফেল'। ওরা ঘিরে ফেলেছে ওকে। ওকে মেরে ফেলবে। ওকে পালাতে হবে। দূরে এদের ছাড়িয়ে অন্য কোথাও। পালাও নীলাঞ্জন—পালাও। বাঁচতে চাওতো পালাও। নীলাঞ্জন মরীয়া হয়ে ছুটতে লাগলো।

তার পিছনে ধেয়ে আসছে হিংস্র শব্দগুলো—অজস্র শব্দের স্রোত—সে আরো জোরে ছুটতে লাগলো, জোরে—আরো জোরে···আরো···আরো।

এক সময় নীলাঞ্জন মাথার ভেতরের তীব্র যন্ত্রণাটা একটু একটু করো কমে এলো। সেই প্রচণ্ড উত্তাপ এখন অনেকটা কম। তার চারদিকের অন্ধকারটা ক্রমশ ফিকে হয়ে আসছে। সে এখন কোথায়? তার চারদিকে এরা সব কারা? একি! এতো ট্রেন। সে তাহলে ট্রেনে চেপে বসেছে। সে ভালো করে চারদিকটা তাকিয়ে দেখল। কয়েক জোড়া কৌতূহলী চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিজেকে তার বেশ অপ্রস্তুত লাগলো। কি ভাবে সে গাড়ীতে উঠে পড়েছে, কি কান্ড ঘটিয়েছে কি জানি। যা চেহারা খানা হয়েছে তার। গাড়ীর লোকজন সব কি ভাবল। মাঝে মাঝে কি যে হয়ে যায় তার। কি যেন হয়েছিল তার। কারা যেন একে তাড়া করেছিল। সে শুধু ছুটছিল—আর ছুটছিল।

"কি ভাই এখন একটু সুস্থ বোধ হচ্ছে? এভাবে কখনো গাড়ীতে উঠতে আছে? গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, আর তুমি ছুটতে ছুটতে এসে লাফ দিলে। আমি যদি না ধরে ফেলতাম তবে কি হতো বলো তো? না হয় পরের ট্রেনে আসতে। খুব জরুরী কাজ আছে বুঝি? হাওড়া যাবে তো?"

নীলাঞ্জনের সামনের ভদ্রলোকের দিকে চাইতে লজ্জা করছিল। শুধু ঘাড় নাড়ল সে, যেন তাঁর কথাই ঠিক। "আমি ও যাব। এসে গেলাম প্রায়। দাশনগর পেরিয়ে এসেছি।"

এই মাঝ বয়সী ভদ্রলোকের দিকে চাইল সে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে। মনে মনে ধন্যবাদ জানালো তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে। কিন্তু আর বেশী ঘনিষ্ঠতা নয়। তাহলেই নানান ফিরিস্তি। নাম কি? কোথায় বাড়ী? আর তারপরেই সেই প্রশ্নটা—সেই ঘৃণ্য শব্দটা—কি কর? সে জানলার দিকে সরে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াতেই নীলাঞ্জন ছিটকে গেল অন্যদিকে। টিকিট নেই। একটু ফাঁক দেখে বেরিয়ে যেতে হবে। আপাতত ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল সুযোগের অপেক্ষায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষের স্রোত দেখতে লাগলো। এক

একটা ট্রেন এসে প্ল্যাটফরমে ঢুকছে, আর গাদা গাদা লোক ট্রেন থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছে। ওদিক থেকে আবার মানুষ ছুটতে ছুটতে এসে প্ল্যাটফরমে ঢুকছে। আসছে আর যাচ্ছে। শত শত ব্যস্ত মানুষ। যেন এক অবিছিন্ন স্রোত। বিরাম নেই—শান্তি নেই, শুধু চলতে থাকা। আসা আর যাওয়া।

আবার তার মাথাটা ঝিমঝিম করতে শুরু করল। চারদিকে ফিসফিসানি। সবাই যেন তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি সব বলছে। এত মানুষ কোথায় যাচ্ছে? এত মানুষ কোথা থেকে আসছে? ওই বিরাট যন্ত্র দানবটা আক্রোশে ফুঁসছে। যেন সব মানুষকে গিলে ফেলবে এক্ষুনি। তার পেটে আগ্নেয় ক্ষুধা। সব মানুষকে তুলে নেবে তার পেটের সমস্ত গহ্বরগুলোতে। মানুষেরই সৃষ্ট দানব মানুষেরই প্রতি তীব্র ঘৃণায় মানুষের প্রতি জেহাদ ঘোষণা করেছে। তার চোখ থেকে ঝরছে আগুন। তার নিঃশ্বাসে উষ্ণতা। শৃংগায় ফুঁ দিয়ে চলেছে সে। অথচ নির্বোধ মানুষগুলো ছুটতে ছুটতে গিয়ে স্বেচ্ছায় ঢুকে যাচ্ছে তারই পেটের ভেতর। চারি দিকে বিদঘুটে শব্দরা সব নেচে বেড়াচ্ছে। মানুষের নির্বুদ্ধিতায় তারা হাসছে। কিন্তু মানুষ কেন যন্ত্রের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে? যন্ত্রের মধ্যে মানুষ! নীলাঞ্জনের মাথার ভেতর অসহ্য যন্ত্রণা। বিকৃত শব্দের উদ্দাম নৃত্য। মানুষ ছুটতে ছুটতে গিয়ে স্বেচ্ছায় যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করেছে। বেরিয়ে আসছে এক একটি যন্ত্র হয়ে। মানুষের স্রোত। সবাই ছুটছে। নিজেকে সঁপে দিচ্ছে যন্ত্রের ভেতর। কেন? কেন অ্যামন হবে? কেন? কেন?

নীলাঞ্জন সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে উঠল—"আপনারা কেউ যাবেন না। শুনুন, আপনারা শুনুন, এভাবে নিজেদের নিঃশেষে সঁপে দেবেন না। একটু অন্তত ভেবে দেখুন। এভাবে যন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পন নয়। আপনারা কেউ যাবেন না। দাঁড়ান, দাঁড়ান বলছি।" নীলাঞ্জন ছুটে যেতে চাইলো ওদের সামনে। ওদেরকে আটকাতে চাইলো। দূরে সরিয়ে দিতে চাইলো দু'হাত দিয়ে। সে মরীয়া হয়ে উঠল। তাকে একাজ করতেই হবে। কিছুতেই মানুষকে এভাবে হারিয়ে যেতে দেওয়া যায় না—দিতে নেই।

নীলাঞ্জন ছুটে গেল আরও ভীড়ের গভীরে...

কী যেন হলো। কারা যেন তাকে জাপটে ধরেছে। তার সারা শরীরে

ভীষণ যন্ত্রণা। কোথায় যেন তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সে যেন কে ?……সে যেন কোথায় যাবে ? ……এত লোক কেন ? ……সে তো লোক চায় না, সে তো নির্জনতা চায় ? ……সেই মুখটা কেন চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে ? …সেই লম্বাটে মুখ…টানা বড় চোখ কালো মনিতে নীরব ভাষা…আঃ, তুমি যাও সামনে থেকে আমি তোমাকে চিনি না। …আমি জানি অন্য এক মুখকে…সে আমার কবিতা। নীলাঞ্জন বিড়বিড় করতে থাকে—

দূরের সবুজ প্রান্তরে দ্যাখো দুটো গাছ
দীর্ঘকায় সুখের অতলস্পর্শী মায়ায় অম্লান,
পশ্চিমের ঝিলে তাদের ছায়া তরঙ্গের রেশ নিয়ে
যেখানে তোমার আঁচল এইমাত্র তোমাকে
ছাড়িয়ে আমার অপেক্ষায়।
এখন এসো, কথা শোন ঐ গাছটার যেখানে
তার ছায়ার সাথে তোমার আঁচল জড়িয়ে
লাজুক লাজুক শব্দের ব্যস্ততায় সময় পেরোয়
তুমি শোন তাব কথা, নীরব শুধু আমি
তোমার কাছে, গাছের কাছে, নীল ঢেউ এর কাছে
যেখানে শুধু শুধু কৃত্রিম ব্যস্ততায় সূর্য নিভে যায়।
আমি দেখি, আমার কাছে-ই এক নারী
ঝিলের জলে চোখ রেখে দু'হাতে ধরে থাকে
ছায়া, গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছায়া—
কি এক মায়াময়তায় নিবিষ্ট সত্বায়
আঁকে ছবি, কল্পনায়, শুভ্র অল্পনায়
শুধু ধরা দেয় মনের মধ্যে, ছায়ার মধ্যে,
চুপিচুপি কাছে আসে বাড়ীঘর
সুকঠিন দৃঢ়তায় পরিণত বাস্তব বিভেদ প্রাচীর তুলে ধরে,
একক বিচ্ছিন্নতায় একা আমি আমার সত্বায়,
এই গাছের ছায়ায়, নীল আকাশের ছায়ায়।'

# চোর-পুলিশ খেলা

রেলের রাস্তার উপর মতি আর আমি পাশাপাশি হাঁটছিলাম। তার মাথার রুনো চুল থর থর করে কাঁপছিল। তার খোঁচা খোঁচা দাড়ির মধ্যে পশ্চিমের সূর্যটা হারিয়ে যাচ্ছিল। আমি চেয়েছিলাম ওর দিকে। ওর গর্তে ঢোকা চোখ দুটো বাতাসে ভেসে ভেসে কোথায় যেন চলে গেছিল। আমি তার কপালের ভাঁজের ভেতরে, তার চোখের ভেতরে, তার বুকের ভেতরে কি যেন খুঁজছিলাম।

আমার বুকে একটা ঝড় ছিল। দশ বছরের ঝক্‌ঝকে আলোয় বোনা আমার বাহারী শালটা আমি মতির বুকের উপর মেলতে চাইছিলাম। পারছিলাম না। ভয় হচ্ছিল, যদি সে তার দশবছরের ছেঁড়া ময়লা গামছাটা আমার বুকের উপর মেলে ধরে? আজ আমি মতির পাশে পাশে হাঁটছিলাম। ওর পাশে পাশে থাকতে ও চাইছিলাম। অথচ আমার বেশ ভয় ভয় করছিল।

আমি মতিকে ডাকলাম। থমকে দাঁড়ালাম। আবার ডাকলাম—আবার ডাকলাম। সে আমার দিকে চাইল। আমি বলতে চাইলাম, 'কেন? কেনরে এমন?' সে আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আবার চলতে লাগলো। বললাম, 'আর কতদূর যাবি? দেখ্ সূর্যটা কেমন ডুবে যাচ্ছে।'

মতি হো হো করে হেসে উঠল। ওর চোখ এখন পালিশ করা আয়নার মত। সে তার কপালের চুলের গোছাটাকে পিছনের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'কেনরে, ভয় পেলি? অন্ধকারের ভয়?'

আমার বুক কেঁপে উঠল। মতি তখনো হেসে চলেছে। আমার নিজের মাথাটাকে বেশ ভারী ভারী মনে হচ্ছিল।

তারপর হঠাৎ মতি সব ঝেড়ে মুছে ফেলল। বলল, 'চল্ তাহলে ফেরাই যাক্।'

এক ঝলক দখিনা বাতাস আমার বুক ছুঁয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মতি, তোদের এইখানটায় কোথায় একটা জমি আছে না?' সে বলল, 'আছে নয়, ছিল। বাবা বিক্রি করে দিয়ে গেছেন।'

ও একটু থামল। সূর্যের দিকে তাকাল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'দু' বিঘা জমি আর একটা বোনের স্বামী-স্বর্গ লাভ।' সে বড় অদ্ভুত রকমের হেসে উঠল।

আমি তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমি ওর বুকের ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। দেখলাম, আমি একটা অন্ধকার খাদের মধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছি। আমার ভয় হল। উঠে আসতে চাইলাম মরিয়া হয়ে।

বললাম, মতি তোর মনে আছে, আমরা এই রেলের রাস্তার ধারে চাঁদের আলোয় কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি। কতদিন একটা রেলপাতের উপর দিয়ে কে কত দূর যেতে পারি তার প্রতিযোগিতা করেছি।'

মতি থমকে দাঁড়াল। ঘুরে দেখল পিছন দিকটা। চেঁচিয়ে উঠল, 'বরুণ সরে যা, গাড়ী আসছে।'

আমি ঠিকরে এলাম এধারে। ও ছিটকে গেল ওধারে। আমার পায়ের মাটি ভূমিকম্পের মত কাঁপতে লাগলো। একটা সাদা ছাগলছানা রেলগাড়ীর ছুটন্ত চাকায় টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ওর কয়েক ফোঁটা গরম লাল রক্ত আমার বুকে ঠিকরে এসে পড়ল। তারপর ক্রমে সব নিথর হয়ে গেল।

আমি বললাম, দেখলি মতি, এত সুন্দর ছাগল বাচ্চাটা হঠাৎ কেমন মারা গেল।'

মতি সন্ন্যাসীর মত হাসলো। আমি দেখলাম ওর বুকের উপর কয়েক ফোঁটা ঐ একই লাল রক্ত।

আমি তার চোখে চোখ রাখলাম। ও জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম। 'হ্যাঁ রে, তোদের আর জমি নেই না?'

সে বলল, 'আছে। আড়াই বিঘা।'

আমি কি বলব তাকে ভেবে পাচ্ছিলাম না। বললাম, 'কিছুতেই একটা চাকরি জোটাতে পারলি না? তোর মত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে… ।'

মতি বিকট শব্দে হো হো করে হেসে উঠল। আমি নদীর স্রোতের মুখে খড়কুটোর মত ভেসে গেলাম। ও তখনো একটানা হেসে চলেছে। বাতাস কাঁপতে

কাঁপতে আমার চুপসে যাওয়া হৃৎপিণ্ড ছুঁয়ে কাকে যেন খুঁজতে চলে গেল। টেলিগ্রাফের তারে বসা ফিঙে পাখিটা বিরক্ত হলো। ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল পশ্চিমের সূর্যের দিকে।

মতি আস্তে আস্তে মধ্য রাত্রির মতো হয়ে গেল। তখন আমার ভীষণ শীত শীত লাগছিল। আমি তার কাঁধের উপর হাত রাখালম। মতি আমার দিকে তাকাল। আমার হাতটা টেনে নিল ওর হাতের মধ্যে।

বলল 'দেখ্ বরুণ, ধীরে ধীরে কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে। চারদিক কেমন আবছা আলো—আবছা অন্ধকার।'

তারপর কী যেন ভাবতে ভাবতে থেমে গেল ও। আমার হাতটাকে অনেক জোরে আঁকড়ে ধরল। বলল, 'এক কাজ করবি ?'

আমি তাকালাম ওর দিকে। ওর মুখ তখন অনেক ছোট, সবুজ আর পবিত্র হয়ে আসছিল।

ও বলল, 'আয়, আমরা এই আলো আঁধারিতে সেই আগের মতো চোর-পুলিশ খেলি।'

# পাঁচুগোপালের পাঁচালী

ঠিক একই সময়ে আজও পাঁচুর ঘুমটা ভেঙে গেল। ডাক মোরগের ডাক সবে ভেসে আসতে শুরু করেছে। বাইরের জমাট আঁধার পাতলা হয়নি এখনো। সেই কবেকার থেকে অভ্যেস তার এমনি ভোরে ওঠার। সকলের আগে মাঠে লাঙ্গল নিয়ে যেত সে। চাষের কাজে কি যেন এক নেশা আছে। অপরের জমি হলেও সে সেই নেশায় মশগুল হয়ে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সাথে। আজ আর এত ভোরে ঘুম থেকে ওঠার দরকার না থাকলেও অভ্যেস যায় না। ঠিক ঘুম ভেঙে যায়। মাসখানেক ধরে এমনি-ই হচ্ছে। রোজকার মত আজও পাঁচু মট্‌কা মেরে পড়ে রইল। আজও শুনল এদিক ওদিক থেকে মোরগগুলান ক্রমে ক্রমে পাল্লা দিয়ে ডাকাডাকি শুরু করল। পুব আকাশের শুকতারাটাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেল তার দিকে হাসি হাসি মুখ নিয়ে চেয়ে থাকতে। গাছে গাছে পাখির ডানার ঝটপটানি আর খুশীর গান সে বুক ভরে তুলে নিতে চাইল। দু একটা 'হ্যাট' 'হ্যাট' শব্দ পাশের রাস্তা থেকে উঠে এলো তার কাছে। এই বৈশাখের দিনে সবাই ভোর ভোর মাঠে লাঙ্গল নিয়ে, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে চায়। অথচ তাকে এখন ও শুয়ে থাকতে হবে। লাঙ্গলটা কাঁধে নিয়ে গরু দুটোকে তাড়াতে তাড়াতে মাঠ নিয়ে যাওয়ার জন্য বুকটা যতই উথালি পাথালি করুক না কেন তার আর যাওয়ার উপায় নেই। তার এই ত্রিশ বছরের শরীরটা হঠাৎ অচল হয়ে গেছে। আসলে হঠাৎ নয় হয়তো, ভেতরে ভেতরে ভিত্ আলগা হয়েআসছিল। সে বুঝতে পারেনি। ডাক্তারবাবুও বলছেন অনেকদিন ধরে ঠিক মতো না খেয়ে আর বেশি খাটাখাটনি করে রোগটা বাধিয়েছে সে। তাড়াতাড়ি নাকি সারবে ও না এই রোগ! ভালো ভালো খাওয়া আর বিশ্রাম নিতে হবে অনেক-দিন। সেই যে এক দিন হঠাৎ অজ্ঞান হয়েগেছিল মাথা ঘুরে, তারপর থেকে এখনো অবধিক্যামন যেন অবশ হয়ে গেছে তার শীরর। দু' পা হাঁটলেই মাথাটা ঘোরে।

বাচ্চা ছেলের মত টলে টলে পা ফ্যালে। পৃথিবীটাকে দুলতে দেখে। বুকের ভেতর ধপধপানিটা বেড়ে যায়। দশদিন হাসপাতালে কাটানোর পর আজ মাস খানেক হলো তাকে তাই শুয়ে বসে কাটাতে হচ্ছে। দিনরাত এভাবে শুয়ে বসে কাটানোর বড় যন্ত্রণা—কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারছে না এটাকে। লাঙ্গলের বোঁটাটা হতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরে মা ধরিত্রিকে ঝুরঝুরে আলগা করে দেওয়ার আনন্দ পেতে তার প্রাণ আঁকু পাঁকু করে। সন্তান প্রসবের যন্ত্রণার মতো এক গভীর সুখ আছে ফসল জন্মানোর কাজে। অপরের জমিতে কাজ করেও সে এসব টের পেয়ে এসেছে। আসলে সে ভাবেনি এতদিন কার জমিতে কাজ করছে, কার জন্য তার এই শ্রম। আজ এই নিষ্কর্মার মতো জীবনে সে মাঝে মাঝে ভাবে এসব। তার এই দুঃখের দিনে যাদের ঘরে এত টুকুন বয়স থেকে খেটে এল তাদের ক'জন কাছে এসে দাঁড়াল ? এই অল্প ক'দিনে ছাগল দুটো, মুরগী পাঁচটা শেষ হয়ে গেল। তার বউকে খাটতে যেতে হচ্ছে বিলাস বাবুর মতো নোংরা মনের মানুষের ঘরে। সাহায্য তো দূরে থাক দু-একজন আবার তাদের লক্‌লকে জিভটা মেলে ধরেছিল তার ছোট্ট বাস্তুটার জন্য। পাঁচুর শুয়ে বসে কাটানো জীবনটাতে এমনি সব ভাবনা বার বার ঘুরে ফিরে আসে। মাথাটাকে গরম করে দেয়, কাজ করতে না পারার কষ্ট বুক জুড়ে ঝুলে থাকে। ডাক্তারের কথা মতো ভালো ভালো খাওয়া দাওয়া করা তো দূরে থাক ঠিক মতো পেট পুরে দু'বেলা দু'টো ভাত ও পায় না। শুধু শুয়ে শুয়ে তার বউ শান্তিকে শীতের শিরীষের মতো হয়ে যেতে দেখে। বাচ্চা মেয়েটাকে খাবারের জন্য কাঁদতে শোনে। আর নিজে রক্তাক্ত হয় মনের গভীরে। পাঁচু শুয়ে শুয়ে বুঝতে পারছিল আজও এই রকম একটা দিন থাবা উঁচিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

রোদ যখন ঘরে ঢুকে তার শরীরের আধখানা জুড়ে পড়ে রইল, তখন পাঁচু বিছানা ছাড়ল। এতক্ষণে শান্তি ঘরের কাজ সব গুছিয়ে কাজে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। যাওয়ার সময় পাঁচুকে বলে গেল দাঁত মেজে চাট্টিখানি পান্তা ঢাকানো আছে তা খেয়ে নিতে। মেয়েটাকে কোলে নিয়ে শান্তি চলে গেল— পাঁচু চেয়ে রইল সেই দিকে কিছুক্ষণ। ছেলেটা বেঁচে থাকলে বছর পাঁচেকের হতো।

মেয়েটারও চেহারা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অথচ সাত আট বছর আগে

যখন সে শ্যামলা রঙের আঁটোসাঁটো শরীরের শান্তিকে ধরে নিয়ে এল তখন সারা বুক জুড়ে ছিল সুখের স্বপ্ন। তার পেশীওয়ালা তাগড়াই শরীরটার উপর সে অনেক ভরসা রেখেছিল। শান্তিও পূর্ণিমা রাতের মতো আলো করে রেখেছিল তার ঘরকে। তার মার সাথে সুন্দর মানিয়ে নিয়েছিল। দু-একদিনের ছোট খাটো ঘটনা ছাড়া তেমন কোন ঝগড়াঝাঁটি হয়নি শান্তির সাথে তার মার। গত বছর তার মা মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত মা-মেয়ের মতো দুজনে ঘর করেছে। তার অভাবের ঘরটাকে এমনভাবে আগলে রেখেছে যে পাঁচু অবাক হয়ে যায় মাঝে মাঝে। আর এখন তো পুরো সংসারের দায়িত্ব সে কাঁধে তুলে নিয়েছে! বিলাশ বাবুর বাড়ীতে কাজে যেতে দিতে চায়নি সে প্রথমে। মেয়েমানুষের দিকে চকচকে লোভী দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখেছে তাঁকে। কিন্তু শেষমেশ কোন উপায় না পেয়ে শান্তি ওখানেই কাজ আরম্ভ করেছে।

রোদের তাপ ক্রমশঃ বাড়ছিল। সূর্যটা যতই মাথার উপরের দিকে উঠে আসছিল ততই। আগুনের হল্কা বইতে শুরু করেছে। পাঁচু গুটি গুটি করে পাড়ার পঞ্চায়েতের কলটায় গিয়ে স্নান করে এল। স্নান করে ফেললে খিদেটা বড় চাগিয়ে ওঠে। শান্তি দুটো আড়াইটার দিকে ঘরে ফেরে। ওকে খেতে দেওয়া একথালা ভাত, তরকারী সেখানে না খেয়ে ঘরে নিয়ে আসে। একজনের ভাত তিনজনে ভাগ করে খায়। সেই জন্যে পাঁচু একটু বেলা গড়িয়েই স্নান করে। কিন্তু আজ বড় গরম পড়েছে। একটু তাড়াতাড়ি-ই স্নান করল সে, ঢক্ ঢক্ করে ঘটি খানেক জল পেটে চালান করল। চাটাইটা পেতে আধ-শোয়া হয়ে বাইরের রোদের দিকে চেয়ে রইল। ঝম্ঝম্ করে একটা রেল গাড়ী চলে যাওয়ার শব্দ ভেসে এসে ঘরের নিস্তব্ধতাকে ছিঁড়ে ফেলল। পাঁচুর মনে হলো বারোটার গাড়ী এটা। এতক্ষনে চাষীরা সব লাঙ্গল ছেড়ে ঘর মুখো হয়েছে। তাদের নুন ফুটে ওঠা চামড়ায় আগুন পানা রোদ বিঁধে যাচ্ছে, আগুন হয়ে যাওয়া মাটির উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসা ক্লান্ত মানুষগুলোকে যেন সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এমনি সব টুকরো টুকরো ছবি সে আজ কাল বুকেব ভেতর থেকে বের করে এনে চোখের সামনে মেলে ধরে। সময় কাটায়, নিজের দুঃখ ভোলার চেষ্টা করে। খিদে চাপার চেষ্টা করে। কিন্তু আজকের খিদেটা যেন একটু বেশী। কিছুতেই ভুলে থাকা যাচ্ছে না। থেকে থেকে জানান দিচ্ছে। মাথাও যেন ঝিমঝিম করছে। এই প্রচণ্ড

গরমে বড্ড অস্বস্তি বোধ করছে সে। আধভাংগা হাতপাখাটা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলো।

হঠাৎ পায়ের শব্দে দরজার দিকে চেয়ে দেখে শান্তি মেয়েটাকে 'কোল থেকে দাওয়ায় বসিয়ে দিচ্ছে। আজ যেন তাড়াতাড়ি ফিরে এল সে। ভালো করে তাকিয়ে দেখে হাতে ভাতের থালাও নেই। আশ্চর্য হলো একটু। শান্তিকে প্রশ্ন করল, ' আজ অত জলদি চলি আইলু যে।" কোন উত্তর পেল না। শান্তি যেন কোন কিছুই শুনতে পায় নি।

"কি রে উত্তর দউটুনি যে বড় ?"

শান্তি নিরুত্তর।

পাঁচুর রক্তের ভেতর যেন বাইরের বোশেখের আগুন ঢুকে যাচ্ছিল।

গর্জে উঠলো সে, "কাজে যাইনি আজ ?"

"না"

"ক্যানে ?"

"অমনিটা।"

পাঁচুর সহ্য হচ্ছিল না আর। পেটের খিদেটা যেন আরও পাঁচগুন বেড়ে যাচ্ছিল।

চোখে আগুন ঝরিয়ে টলতে টলতে দাওয়ায় বেরিয়ে এল সে।

"কাজ করতে যাইনি তো কুনাম্ যাইথ্লু অতক্ষণ ? পাড়ায় পাড়ায় রূপ দেখিই্তে ?"

শান্তি ও যেন মরিয়া হয়ে উঠল। "হুঁ, রূপ দেখিইতে। ভালা করি শুনি রাখ, নাগর খুঁজতে যাইথ্লি আমি। নাগর—বুঝল—নাগর।"

পাঁচুর রক্তটা যেন ফুটে উঠলো টগবগিয়ে। সে ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো হয়ে গেলো। শান্তির চুলের গোছা ধরে টেনে এনে প্রচন্ড জোরে কষাল চাঁটিটা। মেয়েটা কেঁদে উঠল। শান্তি টলে পড়ে যেতে যেতে টাল সামলালো। কাপড়টা খুলে গিয়ে কোঁচড় থেকে গড়িয়ে পড়ল কিছু গেঁড়ি।

কি ঘটল পাঁচু যেন বুঝতে পারছিল না। দু' হাতে মাথাটাকে ধরে বসে পড়লে সে। দু চোখে অন্ধকার দেখছিল। মাথার ভেতর যন্ত্রণা। শরীরটা যেন অবশ হয়ে আসছে।

শান্তিও ঘটনাটায় হকচকিয়ে গেছিল। পাঁচুর দিকে তাকিয়েই ছুটে এল

তার কাছে। পাখাটা নিয়ে এসে জোরে জোরে বাতাস করতে লাগলো। ঘটিটা থেকে জল নিয়ে জলের ছিটা দিতে লাগলো তার চোখে মুখে।

"কি গো, কি রকম লাগেটে তুমার? খুব বেশি খারাপ লাগেটে নাকি?" শান্তির গলায় গভীর উদ্বিগ্নতা।

"আমার-ই ভুল, তুমাকে রাগি-ই দিলি। ডাক্তারবাবু কইথুলন কুনঅ কারণে যেন উত্তেজনা নাই জাগে। আমার জন্য কান্ডটা ঘটি গেলা।" কেঁপে যাচ্ছিল শান্তির গলা। পাঁচু ক্রমশঃ সুস্থির হয়ে আসছিল। ক্রমশ ঘটনাটা পরিষ্কার হচ্ছিল তার কাছে। সে মুখ তুলে চোখ রাখল শান্তির চোখের উপর। শান্তির টলটলে চোখ দুটোয় তখন উৎকণ্ঠার ভয়ার্ত চাউনি তার মুখের উপর স্থির। পাঁচুর বুকটা ভরে উঠল। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো।

"নারে, শরীর ঠিক আছে, তুই অত ভয় পাউটু কেনে?"

"খুব ভোক পাইচে না? সারা সকালটা ঘুরি কি আইলি, কাঁহবি কাজ পাইলি নি। চাউল টাউল বি পাইলি নি। গেঁড়াগুলা সরকার বাবুর গাড়িয়ানু ধরি আনচি। দাঁড়াও অক্ষুণি রাঁধি দেইটি।"

"তুই বিলাস বাবুর ঘরকে কাজ করতে গেলুনি কেনে?" শান্তি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, "বিলাস বাবুর নজর বড় ছোট গো, কাল আমাকে......" শান্তির গলা ধরে এল। নীচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল। মেয়েটাকে টেনে নিল কোলে। পাঁচু চেয়ে থাকে শান্তির দিকে। নিজেকে বড় বোকা মনে হল তার। এই কথাটা সে এতক্ষণ বুঝতে পারেনি।

"ঠিক করচু নাই যাইকি। যে কাঁরকি হউ চালি যাবে সংসার। হুঁ রে, তোর খুব লাগচে না চাঁটিটা?"

শান্তি হাসি ঝরায় মুখ জুড়ে। চোখ রাখে পাঁচুর উপর। "না, লাগেনি তো মোটে।"

দু'জনে চেয়ে থাকে দু'জনের দিকে। পাঁচুর মনে হয় বোশেখের এই আগুনের হুঙ্কার মধ্যেও তার বুকের ভেতর আর এতটুকুও তাপ নেই। একটা নদী তার রক্তের ভেতর দিয়ে কুলকুলু করে বয়ে যাচ্ছে। শান্তির গর্তে ঢুকে যাওয়া চোখ দু'টো যে এত সুন্দর পাঁচু তা এতদিনে ও লক্ষ্য করে নি।

# শান্তনু ও একটি শালিক

আজও শান্তনুর ঘুম ভাঙল শালিকটার ডাক শুনে। সোনালী রোদ্দুর তখন পুবের খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে তার সারা শরীরে জড়িয়ে গেছে। বেশ বেলা হয়ে গেছে তো! সে ধড়পড়িয়ে উঠে বসল। দু'হাতে দু'চোখ কচ্‌লে জানালার দিকে তাকাল। হ্যাঁ ঠিক, শালিকটা জানালার বাইরে বাগানে গন্ধরাজ গাছটাতে বসে রয়েছে। ক'দিন ধরেই রোজ শালিকটাকে দেখছে। যেন তার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে আসে রোজ। 'কিরুর্ কিচ্' করে অনর্গল কি সব বলে যাচ্ছে। শান্তনু উঠে জানালার ধারে গেল। শালিকটা ফিক করে হেসে দিয়ে উড়ে এসে তাকে যেন বলল, "এতক্ষণে ওঠা হল শান্তনুবাবুর, সেই কখন থেকে ডাকছি। ঘুম আর ভাঙে না যে তোমার।" শান্তনুরও একটু লজ্জা হল। বলল, "কি করব বল, কিছুতেই ঘুম ভাঙতে চায় না যে। তা তুই কখন উঠেছিলি?" "সে কি এখন, সে তো কোন ভোরে। ঘুম থেকে উঠলাম, ঠাকুর প্রণাম সারলাম, মল্লিকদের নিমগাছটায় বসে গলা সাধলাম, তার পর এলাম তোমার ঘুম ভাঙাতে।" শান্তনু যেন শালিকটার সব কথা বুঝে নিচ্ছিল টপাটপ। সে বলল, "ওরে বাপরে, এত ভোরে তুই উঠিস। আর উঠবি নাই বা কেন, তোকে তো আর ঘুম থেকে উঠেই আমার মত পড়তে বসতে হয় না, খালি নেচে গেয়ে বেড়ানো।"

আর ঠিক শালিকটার সাথে শান্তনুর জমে যাওয়ার মুহূর্তেই মার তেতো গলা, "কিরে উঠেছিস? সেখানে কি করছিস?" শান্তনু মুখে হাসি ঝরিয়ে বলল, "দেখ মা, শালিকটা আজ কত কাছে চলে এসেছে, ভয় পাচ্ছে না একটুও।" "তুই তাহলে এতক্ষণ ধরে ওর সাথেই বিড়বিড় করছিলি? ফের পাগলামী? গাছপালা পশু পাখিদের সাথে তোর যত কথা না? কই মাষ্টারমশাই এলে তো মুখ ফোটে না। আর একদিন দেখি ঐ রকম বিড় বিড় করতে, সেই দিন

দেখাব মজা।" শান্তনু নীচের দিকে মুখ করে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখছিল মাকে আর বোঝার চেষ্টা করছিল কতটা বিপদ আসতে পারে। "আরো দাঁড়িয়ে আছিস, তাড়াতাড়ি দাঁত মেজে এসে খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর। মাষ্টারমশাই-এর যে আসার সময় হয়ে এলো সে খেয়াল আছে ?"

শালিকটাও বোধ হয় বুঝতে পারছিল গতিক সুবিধের নয়। ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়ে বসল শিরীষ গাছটার মগ্ ডালে। শান্তনু একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলে অনিচ্ছার সাথে গেল কলতলার দিকে। আজকে যদি পড়তে না হত, আঃ কি মজাই না হত তাহলে। সারাদিন যদি গাছ গাছালির ভেতর, পাখি-ফুল-পুকুরের জল আর আকাশের মাঝে শুধু খেলা আর খেলা। পড়তে ভালো লাগে না একদম তার। অঙ্ক কষতে বসলেই সব গুলিয়ে যায়। যোগ এর জায়গায় গুন গুনের জায়গায় ভাগ করে বসে। মাষ্টারমশাই যত বুঝিয়ে দেন ততই সে গুলিয়ে ফেলে। ফলে যা হওয়ার তাই হয়। জোটে চড় চাপড়। সাথে গালাগালি। এসব তার প্রতিদিনের বরাদ্দ। আর ইতিহাসটা নিয়ে তার হয়েছে মুশকিল। গল্প সে ভালোবাসে—সুযোগ পেলেই দেখিয়ে এবং লুকিয়ে গল্পের বই পড়ে। তাই ইতিহাসও তার ভালো লাগার কথা। কিন্তু যুদ্ধের কথা পড়লেই তার গা-টা কেমন শিরশির করে ওঠে। দুঃখ আর ঘৃণায় তার ছোট্ট বুকখানি ভরে ওঠে। মানুষ এত নিষ্ঠুর হয় কি করে—মানুষ অযথা মানুষকে খুন করে কেন ? রাজারা সব কেন বোঝেন না একটা যুদ্ধ মানেই রক্তের বন্যা। এই জন্য তার অশোককে ভালো লাগে। তার মনে প্রশ্ন জাগে সব রাজারাই অশোকের মত হলে ক্ষতি কি হত ? শান্তনু মাঝে মাঝেই তাদের বাগানের নিমগাছটাতে হেলান দিয়ে বসে বসে ভাবে এসব। আর তখন-ই তার মন ইতিহাস থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে চায়। তবু বাবা-মা-মাস্টারমশাই সবাই তাকে জোর করে ইতিহাস পড়াবেন। সেও বই এর পাতা খুলে পড়ে যায় এইসব কীর্তিকাহিনী। অথচ তার মন চলে যায় অন্য কোন নীল রাজ্যে, যেখানে গানের মত পবিত্রতা নিয়ে বয়ে যায় এক নদী। তার পাল তোলা নৌকো সেই নদী দিয়ে তরতর করে ছুটে চলেছে। দুপাশে হাসি ঝরানো গাছ-গাছালি, ফুল-ফল, পাখি, ফসলের ক্ষেত আর নতুন সব মানুষজন। সে বুঝতে পারে এই দেশেই কোথাও না কোথাও একটা গাছ দু'হাত ওপরে তুলে শ্রীচৈতণ্য হয়ে আছে। আর তার ডালে একটি শালিক 'কিরর্ কিচ্' করে বলে চলেছে 'সবাইকে ভালোবাসো'।

শান্তনুর ইচ্ছে করে সে এমনি এক শালিক হয়ে, এমনি এক দেশে চলে যায়। তাহলেই ভোর হওয়ার সাথে সাথেই পড়তে বসা নেই, বড়দের চোখ রাঙানি নেই, কানমলা নেই—শুধু সামনে ঝুঁকে পড়া বিরাট সাদা দাড়িওয়ালা মানুষ তাকে শোনাবে গাছে ফুল ফোটানোর আনন্দের গান, পাখিদের বাসা বোনার মজার গল্প নদীর গান গাওয়ার বিচিত্র কথা, আর আকাশের সাদা মেঘের নীচে অন্যসব অদ্ভুত মানুষের কাহিনী যারা যুদ্ধের নাম শোনেনি।

সে যা করে তাতেই বড়দের রাগ। বাগানে গাছের ছায়ায় বসে প্রজাপতিদের মধু খাওয়া দেখা, পাখিদের সাথে কথা বলা কিংবা রঙীন চক দিয়ে দেওয়ালে, মেঝেতে ছবি আঁকা—সব কিছুই নাকি দোষের। এমনি সব বিদঘুটে কান্ডকারখানার জন্যই নাকি তার পড়াশুনা হয় না। আগে বাবা মারতেন, মা বকতেন, ঘরে-ইস্কুলে মাষ্টারমশাই লাঠি চালাতেন। শান্তনু কিছুই বলত না, কাঁদত না। শুধু ওদের দিকে তাকিয়ে থাকত শীতল দৃষ্টিতে। এখন আর এতটা মারামারি করে না কেউ। মা-বাবা, এঁরা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন তার দিকে। তাঁদের চোখের ভাষা সে বোঝে। কিন্তু সে কি করে বোঝাবে তাঁদের ওর নিজস্ব জগতের কথা। ওঁরা কি করে বুঝবেন তার সেই নদীর কথা, বনের কথা আর সেই শালিকটার কথা। সে শুধু নীরবে তাঁদেরকে বলে, "তোমরা ভয় পেও না। দেখো, আমি ঠিক চলে যাবো এমনি এক ভালোবাসার জগতে।"

শান্তনু এমনি সব অনেক অনেক ইচ্ছাকে বুকের কৌটোর মধ্যে জমিয়ে রেখেছে। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও রোজ যেমন করে ঠিক তেমনি আজও সকালে মাষ্টারমশাই-র কাছে পড়তে বসল। বকুনি শুনল। ছুটির অপেক্ষায় ছট্‌পট্‌ করতে করতে একসময় তার ছুটিও হয়ে গেল। ছুটে গেল সে বাগানটায় কিন্তু গিয়েই তার মুখ শুকিয়ে গেল দিনের শিউলির মতো। কই, আজ তো শালিকটা পেয়ারা গাছে বসে নেই আগের ক'দিনের মতো। এ গাছ ওগাছ, পাঁচিল চারদিক আঁতিপাঁতি করে খুঁজলো সে। না, কোথাও নেই শালিকটা। সে 'আয় আয়' করে ডাকলো। কোন সাড়া পেল না। তার মনে হলো বড্ড ভুল হয়ে গেছে, একটা নাম দেওয়া হয়নি শালিকটার। সে বুঝবে কি করে যে শান্তনু তাকেই ডাকছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল তার। গাছপালা, ফুল, ঘাস, ফড়িং এদের সাথে খেলা করতে, কথা বলতে ইচ্ছে হলো না। পেয়ারা গাছটায় হেলান দিয়ে মল্লিকদের বাগানটার দিকে তাকিয়ে রইল আন-

মনে। মনে মনে বলল, "তুই এলি না কেন রে?' আমার উপর রাগ করেছিস? কিন্তু আমি তো তোকে কিছু বলিনি। আর, মায়ের কথা ধরতে আছে। মায়েরা তো এরকম বলেই। বিকেলে ঠিক আসবি কিন্তু। দু'জনে মিলে জমিয়ে খেলা যাবে। কি, ঠিক আসবি তো?" আর ঠিক এই সময় মায়ের গলা ভেসে এল। স্নান করার তাড়া, খাওয়ার তাড়া, স্কুলে যাওয়ার তাড়া—এইসব তাড়া তাকে গড়িয়ে দিল প্রত্যেক দিনের পথে।

শান্তনু স্কুলে গিয়ে আজ একদম পড়ায় মন দিতে পারল না। ব্ল্যাক বোর্ডের দিকে তাকিয়ে সে শালিকটাকেই যেন দেখতে লাগলো। খাতায় পড়া লিখতে গিয়ে লিখলো, "রাগ করিস না লক্ষ্মীটি। বিকেলে তোর জন্য বাদাম কিনে নিয়ে যাব। দু'জনে ভাগ করে গল্প করতে করতে খাওয়া যাবে।" পাখিটা এই ক'দিনেই বড় ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তার।

ছুটির ঘন্টা বাজতেই শান্তনু মহা আনন্দে বন্ধুদের সাথে হো হো করে চিৎকার করতে করতে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলো। শরীরটা তখন তার যেন বেশ হালকা হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই আকাশে উড়তে পারে। বলতে গেলে উড়তে উড়তেই যেন সে বাড়ী ফিরল। তার পড়ার টেবিলে বই রাখছে এমন সময় সেই পরিচিত আওয়াজটা শুনল। সে চট করে পিছন ঘুরতেই শালিকটা হাসি হাসি মুখে জানলা দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিল ঘরের ভেতর। যেন অপরাধ করে মার্জনা চাইছে। শান্তনু আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "আরে তুই! এসেছিস তাহলে ঠিক। বাইরে কেন? ভেতরে চলে আয়। তোর জন্য বাদাম এনেছি।" শালিকটা তবু আসে না। মাথা বাড়িয়ে এদিক ওদিক চায়। শান্তনু বলল, "দূর বোকা, মা তো এখন কলতলায়। তুই ঢুকে আয়, কেউ কিছু বলবে না।" শালিকটা যেন তার কথা বুঝতে পারল। উড়ে এসে বসল ঠিক তার সামনে মেঝের ওপর। শান্তনু পকেট থেকে বাদামের ঠোঙাটা বের করে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিজে খেতে লাগলো শালিকটাকে দিতে লাগলো। শান্তনু বুক উজাড় করে কথা বলে যেতে লাগলো। শালিকটাও মহা উল্লাসে 'কিরর্ কিচ্' করে কি সব বলে যেতে লাগলো। দুই বন্ধু কথায় কথায় মশগুল। কখন যে মা ঘরে ঢুকে পড়েছেন সে খেয়ালই করেনি কেউ।

"কি রে, পা হাত ধোওয়া নেই, খাওয়া দাওয়া নেই, এখানে কি করছিস? ওমা, শালিকটা একদম ঘরে ঢুকে পড়েছে। এসব তোর আস্পর্ধাতেই হয়েছে।

তাড়া এখুনি, ঘর দোর সব নোংরা করবে, কখন কিসে মুখ দিবে তার ঠিক নেই।" শান্তনু মার বোশেখের রোদের মতো গলা শুনতে পেল।

সে বলল, "থাক না মা, ও খুব ভালো। ও সব কিছু করবে না।"
"দাঁড়া আমি-ই তাড়াচ্ছি নচ্ছারটাকে জন্মের মতো।"

মুহূর্তে ঘটে গেল ঘটনাটা। শান্তনু কিছুই যেন বুঝে উঠতে পারছিল না। তার মাও যেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না নিজের কান্ডটা। শান্তনু স্থির হয়ে তাকিয়ে ছিল শালিকটার থেঁৎলে যাওয়া মাথাটার দিকে। একটা লাল স্রোত গড়িয়ে যাচ্ছিল মেঝেতে। পাখিটার ধূসর ডানা আর হলদে পা দুটো কাঁপতে কাঁপতে নিথর হয়ে আসছে। মায়ের ছোঁড়া পেপার ওয়েটটা তখন ঘরের এক কোনে স্থির। শান্তনুর শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিম স্রোত নীচের দিকে নেমে আসছিল। বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছিল। সে বুঝতে পারছিল যে চেষ্টা করলেও মায়ের দিকে তাকাতে পারবে না কিছুতেই। তাকালেই সে মাকে নয় একটা চেঙ্গিজকে দেখতে পাবে। তার ভারী পাতা-গুলো দিয়ে ভেজা চোখ দু'টোকে ঢেকে ফেলল সে।

আর ঠিক তখনি সে শুনল অনেক অনেক দূর দেশ থেকে ভেসে আসা তার পরিচিত স্বর, "ছিঃ শান্তনু সবাইকে ভালোবাসতে হয়"।

# বাসন্তীর চাকরী

বাসন্তী কোনক্রমে বাসন মাজা শেষ করল। বাসনের গোছাটা নিয়ে উঠতে গেল। বুঝতে পারল পা দু'টো কাঁপছে। মাথাটায় প্রচণ্ড ভার টলে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। তাড়াতাড়ি বসে পড়ল। বসে রইল কিছুক্ষণ সেই কলতলাতেই। প্রচণ্ড শীত করছিল তার। শীত যেন শরীরের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। হাড় পর্যন্ত। হাড়ের ভেতরেও শীত। সকাল থেকেই শরীরটা খারাপ লাগছিল, কাউকে কিছু বলেনি সে। সব কাজ ঠিকঠাক করে গেছে। স্নান করেছে। ভাত খেয়েছে। ইচ্ছে করছিল না খেতে। সব কিছু বিস্বাদ ঠেকছিল। খেয়েছে অনেক কষ্টে। ফেলে দিলে গিন্নিমা যদি বকেন। গিন্নিমাকে সে খুব ভয় করে।

কিন্তু এখন আর কিছুতেই পারল না নিজেকে খাড়া রাখতে। বাসনগুলো ওখানে ফেলে রেখেই কোন রকমে দাওয়াতে উঠে এল। রান্নাঘরের সামনে বারান্দাতে এক চিলতে মিষ্টি রোদ্দুর। মাদুরটা ওখানে পাতল। চাদরটা গায়ে চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ল। তবুও শীতে কাঁপছিল সে। উঠে কাঁথাটাকে টেনে আনল। চাপাল ছোট শরীরটার ওপর। পা দু'টোকে বুকের কাছে ভাঁজ করে এনে পড়ে রইল সেখানে। চোখের পাতাগুলো ও যেন প্রচণ্ড ভারী হয়ে গেছে। তাকাতে পারছিল না। গিন্নিমাকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। তিনি যদি কিছু মনে করেন। রেগে যান। সে জানে এ সময় গিন্নীমা শুয়ে শুয়ে বই পড়েন। বই পড়ার সময় কথা বলা পছন্দ করেন না মোটেই। বিরক্ত হন। মাস খানেক আগেই বুঝে গেছে সে এসব। প্রথম যখন এ বাড়িতে কাজ করতে এল তখনই ভুল করে কথা বলতে গেছিল। তিনি সেবার নাকি ক্ষমা করে ছিলেন নতুন বলে। কেবলমাত্র চোখ রাঙানি জুটে ছিল তার ভাগ্যে। বাসুদা তাকে চুপিচুপি বলে দিয়েছেন, "খবরদার বাসন্তী, ও সময় মাকে একদম

বিরক্ত করবি না। আমাদেরকেই রেহাই দেয় না মা। আর তুই তো কোথাকার কে।" বাসন্তী আর কোনদিন বই পড়ার সময় তাঁর সাথে কথা বলতে যায় নি। কথা বললেই পাছে তিনি রেগে যান, তাঁকে তাড়িয়ে দেন। তবে ?

সে চাকরী করতে এসেছে কলকাতায়। টাকা রোজগার করবে। টাকা পাঠাবে বাড়ীতে। তারা যে বড় গরীব। তাদের যে বড় কষ্ট। টাকা পাঠালে তার বাবা-মা-ভাই-বোন—সবাই কত খুশী হবে। বাবার মাঝে মাঝেই জ্বর হয়। রাতে কাশে খক্ খক্ করে। এখন আর আগের মতো কাজ করতে পারে না। যে দিন শরীর ভালো থাকে সেদিন কাজে যায় বাবুদের বাড়ী। মা সিংহবাবুদের বাড়ীতে কাজ করতে যায় সকাল থেকেই। ফেরে সেই দুপুর গড়িয়ে। দুটো ভাই আর ছোট্ট বোনটাকে নিয়ে ঘরে থাকত সে। ছুটোছুটি করে বেড়াত এখানে ওখানে। চারজনে মিলে কত খেলা। দত্তদের পুকুর দাপিয়ে স্নান করা। ভীষণ মজা ওতে। কখনো বা গেঁড়ি তুলত। একবার গেঁড়ি তুলতে গিয়ে একটা ল্যাঠা মাছ ধরে ছিল সে। লুকিয়ে নিয়ে পালিয়ে এসেছিল ঘরে। মা ভেজে দিলে সবাই ভাগ করে খেয়েছিল। মা ফিরত এক থালা ভাত তরকারী নিয়ে। এক থালা ভাতে কুলোতো না সবার। খিদে কমত না। তাদের পেটে যে বড্ড খিদে। একদিন বোসগিন্নি বলেছিলেন, "এইটুকু পেটে তোরা এত খাবার রাখিস কি করে রে ? পেট ফেটে যায় না ?" সেবার তাঁদের ঘরে বিয়ে বাড়ীর বাসি ভাত-তরকারী খেয়েছিল খুব। তখন সে ছোট্টটি ছিল। এখন তো বড় হয়ে গেছে। তের বছরে পা দিল কি না এই ভাদ্রে। কাজ কাম সব শিখে গেছে। বাসন মাজা, ঘর মোছা, জল তোলা, বাটনা বাটা—সব পারে সে। তাই রাখাল কাকার সাথে চলে এসেছে কলকাতায় চাকরী করতে। রাখাল কাকাই তো তাকে কাজ ঠিক করে দিয়েছে এখানে। রাখাল কাকা অনেকদিন হলো কাজ করছে কলকাতায়। সেবার পুজোর সময় বাড়ী গেছিল। বেড়াতে এসেছিল তাদের বাড়ীতে। তখনই তো তার বাবাকে রাখাল কাকা বলল, "পাঠিদে পচা বাসন্তীকে মোর সাঙে। চাকরী করবে কলকাতায়। খুব ভালা বাবু। কুড়ি টাকা মাইনা দিবে। ভালা খাবে, ভালা পরবে। কুন ভয় নাই তোর। আমি তো আছি।" তার মা রাজী হয়নি প্রথমে। এত টুকুন মেয়ে। যদি কাজ কাম ঠিক মতো না পারে। বাসন্তী হেসে ছিল মনে মনে। সে ছোট কোথায় ? সে তো বড় হয়ে গেছে। খুব খুশী। সে চাকরী করবে

কলকাতায়। মাইনা পাবে। ঘরে পাঠাবে টাকা। তাদের যে বড় কষ্ট। রাখাল কাকার পেছু পেছু হেঁটে এসেছিল খুশীতে ডগমগ করতে করতে। তারপর রেলগাড়ী চেপে সোজা কলকাতায়।

বাসন্তী একটা ঘোরের মধ্যে পড়েছিল সেই দাওয়ায়। বন্ধ চোখের সামনে অনেক ছবি। মাথাটায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। খুব কষ্ট হচ্ছিল তার। বাড়ীটা এখন একদম ফাঁকা। কর্তাবাবু অপিস থেকে ফিরবেন সেই সাঁঝের বেলা। বাসুদাদা আর রুমা দিদিমনির স্কুল ছুটি হতেও বিকেল গড়াবে। গিন্নিমা নীচে নামবেন তার কিছু আগে। তিনি নামার আগেই কি তার শরীরটা ভালো হয়ে উঠবে না? শরীরটা একটু ভালো লাগলেই সে বাসনগুলো কলতলা থেকে তুলে আনবে। কাপড়গুলোও উঠিয়ে রাখবে। রান্নাঘরটা মুছবে। দাওয়াটায় দিতে হবে ঝাঁট। আর তাহলেই গিন্নিমা রাগ করবেন না। গিন্নিমা না রাগলেই তার চাকরী যাবে না। সে মাইনা পাবে মাসে মাসে। টাকা পাঠাবে ঘরে। তার বাবা-মায়ের কষ্ট থাকবে না আর। এখন তো সে বড় হয়ে গেছে। একটু কষ্ট তো তাকে করতে হবেই।

আরও কিছুক্ষণ গড়িয়ে নেবে সে। সারা শরীরময় যন্ত্রণা। চোখের ভেতরে যেন গরম ভাপ। মাথাটা ভারী হয়ে গেছে। পায়ে হাতে যেন বল নাই একটুও। গলাটা শুকিয়ে উঠছে। বড় তেষ্টা, তবু উঠে জল খেতে ইচ্ছে করছিল না। শুধু শুয়ে থাকতেই সাধ হচ্ছিল তার। সে যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিল। অনেক দূর, ঝাপসা ঝাপসা সব মিঠে ছবি। একটা গ্রাম। অনেক বড় আকাশ। চেনা মুখের ভীড়। কোথায় যেন একটা ঘুঘু ডাকছে। একটানা শালিকগুলো কিচির মিচির করে ঝগড়া জুড়ে দিয়েছে। মাটি কাঁপিয়ে রেলগাড়ী চলে গেল একটা। সাঁওতাল মেয়েরা গান গাইতে গাইতে মাঠে ধান কাটছে। একটা ফিঙে উড়ে এসে বসল ছাইরঙা গাইটার পিঠের ওপর। দত্তদের কঁতবেলের গাছটায় কঁতবেল-গুলো চারদিকে সুন্দর গন্ধ ছড়িয়ে ঝুলে রয়েছে। নুন আর লংকা দিয়ে খেতে কী ভালোইনা লাগে। প্রতি বছর মাঘ মাসে সাউবাবুদের মহোৎসব হয়। হরির লুটের বাতাসা কুড়োতে কতো মজা। রোজ বিকেলে বামুন পাড়ার মেয়েরা স্কুল থেকে বাড়ী ফেরে বই বুকে চেপে ধরে। নুপুরদির কপালের টিপটা কি সুন্দর। আর উমাদির কানের দুলটা! অনিমার গলার পুঁথির হারটা যদি সে পেত। তারও স্কুলে পড়তে যাওয়ার বড় সাধ। উমাদিদির ঘরে

কত সুন্দর সুন্দর ছবিওয়ালা বই। একদিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছিল। উমাদি দেখতে পেয়ে ভীষণ রেগে গিয়ে তার দুগালে দু'চাঁটি মেরেছিল। তারপর থেকে সে তার বইতে হাত দেয় নি। গিন্নিমা বলে দিয়েছেন এরকম বদমাইশী করলে তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেবেন। উমাদিদির জামাগুলো কত সুন্দর! আর গিন্নিমার কত্তো শাড়ী! তার মার তো মোটে একখানা, সে যখন বাড়ী যাবে তার মার জন্য একখানা শাড়ী কিনে নিয়ে যাবে। গিন্নিমা বলছেন পুজোর সময় তাকে নতুন জামা কিনে দেবেন। উমাদির পুরানো জামা দিয়েছেন একটা এটাও খুব সুন্দর। সে ওটা গায়ে দেয় কম, যদি ছিঁড়ে যায়! সে যদি অনেক অনেক টাকা পেত তবে বাবার জন্য, মায়ের জন্য, ভাই-বোনেদের জন্য নতুন নতুন কাপড় জামা কিনে নিয়ে যেত। সবাই কত খুশী হতো। বাসন্তীর বুকের ভেতর এমনি শতেক সাধ। চোখের ভেতর এমনি শতেক ছবি। আর চারদিক থেকে তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে শীতবুড়ির সরু আর লম্বা হাত দুটো। ঘন আঁধার নেমে আসছে ক্রমশঃ সেই আঁধারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে ছবিগুলো, তার সব ব্যাথা, সব কষ্ট। সে বুঝতে পারল গভীর ঘুম নেমে আসছে তার চোখ দুটোতে।

আবার এক সময় বাসন্তীর চোখের ভেতর সেই অন্ধকার সরিয়ে আলোর রেখা উঁকি দিল। নিস্তব্ধতার ভেতর থেকে কতগুলো শব্দ তার কানের ভেতরে উঠে আসতে লাগলো। বাসন্তী বুঝতে পারল কে যেন তাকে ঠেলা দিচ্ছে। তার নাম ধরে ডাকছে। কার যেন একটা হাত তার কপালের ওপর নেমে এল। ঠিক যেন মায়ের মতো মিঠে হাত। বড় আরাম বোধ হচ্ছিল তার। সে জানে মায়ের মধ্যে একটা জাদু থাকে। সব ব্যাথা সব কষ্ট সেই হাতে শুষে নিতে পারে। আর শুষে নিলেই তার সব অসুখ ভালো হয়ে যায়। বাসন্তী ওই হাতটাকে নিজের কপালের ওপর তার ছোট্ট দু'টি হাত দিয়ে চেপে ধরতে চাইল। কঁকিয়ে উঠল, "মা, মা-গো"। ভারী পাতা দুটো চোখের ওপর থেকে সরিয়ে তাকালো সে। ফুল ফোটার মতো সে চাউনি। কিন্তু ওটা তো মায়ের হাত নয়। ও মুখ তো মায়ের মুখ নয়। সে চমকে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

গিন্নিমাকে বলতে শুনল, "আহা, উঠছিস কেন? শো, শুয়ে পড়। জ্বরে তো গা পুড়ে যাচ্ছে। শরীর খারাপ লাগছে, তা বলবি তো আমাকে। নিজেও

মরবি আর আমাকেও মারবি। এই যে অসুখ বাধিয়ে বসে আছিস, এখন কে এত এত ঝামেলা পোয়ায়। তখনই আমি পই পই করে বারণ করেছিলুম না। খেতে পাওয়া ঐ শরীরে হাল দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম শীঘ্রই অসুখে পড়ল বলে। এখন যদি বড় কিছু একটা অসুখ বিসুখ করে তবে হাঙ্গামা সামলাবে কে? এখন পয়সা দিয়ে লোক রেখে তার পেছনে টাকা নষ্ট কর, আবার সেবাও কর। এক রাশ কাজ পড়ে রয়েছে, আর ইনি এদিকে জ্বরে বেঁহুশ। সদর দরজা হাঁ হয়ে পড়ে রয়েছে। বাসন-কোসন, জামা-কাপড়—সব চারদিকে ছড়ানো রান্নাঘর খোলা, যদি চুরি হয়ে যেত? কুকুর যদি রান্নাঘরে ঢুকত? এই বাসন্তী, তোর কি মগজে এক-আধটুও বুদ্ধি নেই? কপাটটা লাগিয়ে দিতে পারলিনা? আমাকে ডাকতেও পারলি না? যত সব গেঁয়ো ভূত জুটেছে এসে।"

বাসন্তীর বুকটা কেঁপে উঠল। গিন্নিমা কি রেগে গেছেন? তার ছোট্ট ছোট্ট চোখ দু'টোয় জড় হচ্ছিল একরাশ ভয়। তবে কি……

সে গিন্নিমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে ডুকরে উঠল, "আমাকে চাকরী থেকে ছাড়িই দিবনি মা। আর কখনো এরকম ভুল হবে নি। আমি সব কাজ অক্ষুনি করে দিচ্ছি। আমার তো জ্বর ভালো হইচে।"

বাসন্তী উঠতে গেল। মাথাটায় যেন কি হয়ে গেল তার চারদিকটা ঘুরে যাচ্ছিল অনবরত। আঁধারটা আবার তার চোখের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। টলে যাচ্ছিল প্রায়। হঠাৎ সে বুঝতে পারল গিন্নিমার হাত দু'টো তার শরীরটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে। সে সেই হাত দু'টো চেপে ধরে কি যেন বলতে চাইল নিঃশব্দে।

## সেই মুখ

অমূল্য ফের সেই মুখটা দেখতে পায়। ঘুমোতো পারে না। এপাশ ওপাশ করে। তার অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ—সর্বত্র সে দেখে সেই মুখটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তার জীবন, তার কর্ম, তার আশা, তার ভালোবাসা—সবকিছুর মাঝে সে ঐ মুখটার ছায়া দেখে। রাগ হয়, ঘৃণা আসে, ভয় জানে ক্যামন যেন হয়ে যায় তার সব কিছু। অসহায় মেয়েমানুষের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। তাও পারে না। সব কিছু গুলিয়ে যায়। সে শুধু দ্যাখে একটা ছবি—একটা ছায়া—একটা মুখ। কী বিরাট মুখ অথচ ছোট্ট দু'টি চোখ। চোখের ভিতর থেকে ঠিকরে ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন। গালের থলথলে চর্বি সে আগুনে চক্ চক্ করে। আলো ফেরায় আয়নার মতো। মুখের ফাঁকে কালো কালো দাঁত, জিভে লালা উপচিয়ে পড়ে। থ্যাবড়া নাকের বড় বড় ছ্যাঁদা দুটো দিয়ে বোশেখের বাতাস বয়। সারা মুখ জুড়ে একটা শেয়াল নীরবে হেসে বেড়ায়। অমূল্যের বেড়া মচ্ মচ্ করে ভাঙে। আগুন আর হাসির আঁচে সে কেবলই যায় গলে গলে। ভেসে ভেসে চলে স্রোতের টানে। তার বুকে একটা ঘূর্ণি ঘুরতেই থাকে। সে নিথর থাকতে পারে না, সেও ঘোরে।

অমূল্য মাঝে মাঝে চেষ্টা করেছে পালিয়ে যাওয়ার। দূরে কোথাও, অনেক দূর। বণ-জঙ্গল, পাহাড় পর্ব্বত পেরিয়ে অন্য দেশে। যেখানে সে বুনো মোষের মত সারা গায়ে মাটি মাখিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে গ্রীষ্মের দুপুর। কেউ এসে বলবে না এ মাটি তার নয়। কেউ চাইবে না তার কাছে কোন কৈফিয়ৎ। অন্ততঃ একবার সে চায় তার নিজের মত করে বুক ভর্ত্তি বাতাস টেনে নিতে। মহুয়ার নেশার মতো একটা নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে। পারে না, সে কিছু পারে না, কোথায় যাবে সে ? তার সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে—সব দিক থেকে সেই মুখটা ঘিরে রয়েছে। তার চোখ অমূল্যের দেহে সূচের মতো বিঁধে যায়।

তার জিভ চ্কচ্কৃ করে অমূল্যের রক্ত চাটে। অমূল্য চিৎকার করে উঠতে গিয়ে ও পারে নি। তার গলা কেঁপে গেছে। নিজের গলা নিজের কানে পৌঁছায়নি। ধীরে ধীরে সে সব মেনে নিয়েছে। মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।

অমূল্য নিজের কাজ নীরবে করে যায়। আসলে কোনটা যে তার নিজের, আর কোনটাই যে তার নিজের নয় সেইটাই সে জানে না। লাঙ্গল করে, ধান বোনে, ধান কাটে, ফসল তোলে। তার নিজের জমি ছিল। সোনা ফলত। এখন নেই। ভাগে চাষ করে, জন খাটে। আর মাঝে মাঝে বোশেখ-জৈষ্ঠ্যের সূর্যের নীচে তার পাঁজরার উপর লাঙ্গলের বোঁটা চেপে ধরে কী যেন ভাবে। ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে যায়। তার বুকের ভিতর গরম বাতাস কাটা ঘুড়ির মতো পাল্টি খায়। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ চিৎকার করে উঠতে চায় —'আমার'…'আমার' বলে। তার মুখের উপর আর একটি মুখ অমনি ঝুঁকে পড়ে। চর্বি পিণ্ডের মাঝে দু'টি চোখ গন্গন্ করে টান-মারা কোলকের মতো। অমূল্য লাফিয়ে ওঠে গরু দুটোর পাঁজরার উপর লাঠির ঘা বসায়। ল্যাজ মুড়ে ঠেলা দেয়। গাল মন্দ করে। সেই মুখটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসতে থাকে।

কাকে বলবে সে? কি বলবে? বুকের অনেক অনেক গভীরে লুকিয়ে রাখে কথা। জমিয়ে রাখে। বন্দী করে রাখে। তার বুড়ো বাবা খক্ খক্ করে কাসতে কাসতে হাঁপানির টানে চোখ উল্টে পড়ে থাকে। বউটা ছেঁড়া কাপড়ে বুক ঢাকতে ঢাকতে পাড়ার সরকারী জলের কলে লাইন দেয়। জলে এনে গরম ভাতে ঢেলে তাকে বেড়ে দেয় দু'হাতা। অমূল্য গপ্ গপ্ করে গিলে ফ্যালে। কোঁত কোঁত করে জল খায়। তারপর আধপেট খিদে নিয়ে উঠে পড়ে। ফের চাইতে ভয় হয়। ছেলে মেয়েগুলো চিল্লায়। 'আর দুটি দাও…আর দুটি দাও' বলে কাঁদে। আর সে দেখে তার বউ বকতে বকতে রেগে গিয়ে হঠাৎ এক সময় হাঁড়িটা এনে ঢেলে দেয় তাদের পাতে।

অমূল্য ঘটি থেকে জল ঢেলে ঢেলে তার সাধের জবা গাছটার গোড়ায় মুখ ধোয়। তাকিয়ে তাকিয়ে খোঁজে এক-আধটা ফুলের কুঁড়ি। কি জানি কবে তার গাছে প্রথম ফুল আসবে।

দিন যায়, রাত আসে। রাত যায়, দিন আসে। মুখটাকে দেখতে দেখতে অমূল্যের চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। তার গুমটি বুকে কে যেন ধাক্কা মারে।

পাহাড় ভাঙ্গার মত গম্‌গম্‌ আওয়াজ হয়। সে দ্যাখে ভোরে পূবের রেল লাইনের ওপর সূর্যটা ওঠে, আর সাঁঝের আগে গ্রামের শেষে ন্যাড়া বট গাছটার ফাঁকে টুপ করে কখন ডুবে যায়। সেই চোখটা হাসতে হাসতে তার গায়ে চোখ বোলায়। উল্টে পাল্টে দ্যাখে তার গায়ে কতটা নতুন মাস্‌ গজিয়েছে।

কি জানি তার এত সাধের জবা গাছটা কবে ফুল দেবে। লাল টকটকে রক্ত জবা। তাকে হারানো রক্তের কথা ভুলিয়ে দেবে। উঃ! সে আর পারে না। তার হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগে। সারা বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। হয়তো জ্বর আসে। দলা দলা কালো কফ গলার কাছে। সে আঙুল ঢুকিয়ে দেয় গলায়। ওয়াক ওয়াক করে বের করে আনে কালো কফ আর কিছু লাল রক্ত। তার মরা পেটের নাড়ি ভুঁড়ি উঠে আসতে চায়। সেই ছোট ছোট চোখ দু'টো খবর-দারী করে বেড়ায়, তাকে শাসায়। পাকানো চোখ দুটো থেকে ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে প'ড়ে লাল ফুল্‌কি। অমূল্য হাঁপায়। সে জোর করে চোখের পাতা দুটোকে চেপে ধরে থাকে। চোখ খুলে চালের ফাঁক দিয়ে কালপুরুষ দেখে। ভয় পায়। কি জানি যদি সেই চোখ দুটো……।

ছোটবেলায় অমূল্য বিশ্বনাথ পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ত। সুর করে করে নামতা ডাকত—এক একে এক, এক দুইয়ে দুই…কে যেন তার কানের কাছে তেমনি সুর করে আরো জটিল নামতা ডেকে চলে। কতদিন আগে সে তার মায়ের হাতের পাটালি গুড়ের পায়েস খেয়েছিল। মেনীপিসি বড় সুন্দর পুলি পিঠে বানাতো। ঐতো এই সেদিন যেন। পাকা রুইগুলো জালের মধ্যে কল্‌কল্‌ করছে। কাল তার বিয়ে। বর ধরতে আসবে ওরা। একটা লাল শাড়ী পরা বছর বারো-তেরোর মেয়ে তার দিকে চাইলো পায়রার চোখে। কিন্তু ও মুখের পাশে ওটা কার মুখ। না—না, সে আর চোখ মেলে চাইবে না। ওইতো তার মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে মুখটা। না—না, সে আর পারবে না। কারা যেন ওর বুকে খোঁচা মেরে চলে অনবরত। ওর চোখের পাতা দুটো জুড়ে থাক অনেক-অনেক কালের জন্য। কি জানি, কবে যে তার জবা গাছ তাকে ফুল দেবে। লাল টকটকে জবা।

ভোর হয়। পাখি গান গায়। কালী গাইটা হামলায় বাছুরের জন্যে। সারা রাত তার বাছুর বাঁধা আছে। দুধ খেতে পায়নি। কারা যেন এই সাত-সকালে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। পাশের বাড়ীর রঘু কাকা জুড়ি বাজিয়ে

নাম গান গাইছেন। হলদে ইষ্টিকুটুম পাখিটা তেঁতুল গাছের ডগায় বসে একমনে ডেকে চলেছে। অমূল্যের বউ হ্যাস্ হ্যাস্ করে তাড়ায়। বলে, 'অমনি চাউল্যা বাঢ়া, আরবি কুটুম আইসু। যা যা মুখপুড়া।' হাঁসের ধাড়ীটা প্যাঁক প্যাঁক করে ডানা ঝাপটিয়ে ধীরে ধীরে জলে নেমে চলে যায় বাউরিদের হাঁসের পালের দিকে।

অমূল্যের বড় ছেলে ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢোকে। বাপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ডাকতে থাকে। তার হাতে একটা তাজা জবাফুল।

অমূল্য ধীরে ধীরে চোখ মেলে। ওর বিশ বছরের ছেলের হাতে তার সাধের গাছের ফুল। সে লাফিয়ে ওঠে ছাড়িয়ে নেয় ফুলটা। বুকের ওপর চেপে ধরে জোরে জোরে শ্বাস টানে। এক ধ্যানে চেয়ে থাকে ফুলটার দিকে। ফুলটা কুয়াশার মতো হয়ে যায়। সেই মুখটা ফুলটার ভিতর থেকে উঠে আসে। তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে। ঢুকরে উঠে বলে—'তুই আমাকে ক্ষ্যামা দে অমূল্য।'

অমূল্যের মনে হয় এতদিনে সে প্রাণ খুলে হাসতে পারে। বুকের ভেতর থেকে ভয়টাকে ছুঁড়ে দিতে পারে অনেক দূরে। বুক ভোরে বাতাস টেনে নিতে পারে। অনেকদিন আগের ভুলে যাওয়া গানগুলো গাইতে পারে প্রাণ খুলে।

সে ছেলের হাত দুটোকে টেনে নিয়ে চেপে ধরল বুকের মাঝখানে। ভোরের আলোর মতো দৃষ্টি নিয়ে চোখ রাখল ছেলেটার চোখের ওপর। তার মনে হলো —এবার সে গভীর শান্তিতে চিরকালের মতো চোখ দু'টোকে বন্ধ করে ফেলতে পারে।

# অন্ধকার এবং

অন্ধকারের ভেতর থেকে সুরিয়ার চোখ দুটো জ্বলছিল। শিকারী কুকুরের মতো দু'টো চোখ। কান দুটো খাড়া। ক্ষীণতম শব্দও যেন হারিয়ে না যায়। একটা পরিচিত শব্দের প্রতীক্ষায়। বড় প্রিয় শব্দ তার। আসলে শব্দও ঠিক নয়। ওটা আলো। তার চারদিকে আঁধারের ঢেউ— ঢেউ এর পর ঢেউ। তার বুক চিরে ছুটে আসে একটা আলো। কয়েক লহমার জন্য চারদিক ঝলমলিয়ে ওঠে। কালো মুখটায় আলোর নক্সা খেলে যায়। অন্ধকার খিদেটা পেটের এককোনে গিয়ে লুকোয়। আলোটা তাকে নাইয়ে দিতে থাকে। তারপর ছুটে চলে যায় দূরের দিকে। আবার অন্ধকার তার কালো দাঁতে হাসি ঝরিয়ে সারা পেট জুড়ে নাচতে শুরু করে। তবু সুরিয়া সেই আলোর জন্যই অপেক্ষা করে। সেই শব্দটাকে কানের মধ্যে আটকে রাখতে চায় সারাক্ষণ।

সুরিয়া ডান হাতের চেটোটাকে কানের কাছে ধরল। একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসছে না? তার প্রিয় শব্দটাই কি? তার বুকের দুপদুপুনিটা বাড়তে লাগল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেল সে একেবারে লাইনের কাছে। পাতের ওপর কান রাখল। হ্যাঁ, ঐ আওয়াজটাই তো ছুটে আসছে ডাউনের পাত ধরে। বহুদূর থেকে আসা শব্দটা যেন তার রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। শব্দটা কয়লা ইঞ্জিনের তো? সে আবার কান রাখল পাতের ওপর। ডিজেল ইঞ্জিনের মেয়েলী সুর কি ওটা? তার কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ল। কিন্তু সে ভাঁজ পড়তে না পড়তেই হারিয়েও গেল। এটা বাজখাঁই শব্দ—পুরুষ পুরুষ। কয়লা ইঞ্জিনই। ওর মুখের ওপর থেকে অন্ধকারটা যেন দূরে হটে গেল। সে বাতাস টানল বুক ভরে। মিঠে বাতাস। লাইন থেকে একটু দূরে সরে এসে তার খোঁড়া পা-টার ওপর হাত বুলোতে লাগল গভীর মমতায়।

গাড়ী বোধ হয় মনোহরপুরের ক্রশিংটার কাছাকাছি চলে এসেছে। বেড়াকলমীর

গোলকরে বাঁধা ডালটা হাতে তুলে নিল সুরিয়া। পাঁচ টাকার নোটটা ডালটায় ঠিক মতো গোঁজা আছে কি না পরখ করলো টর্চ জেবলে। গাব গাছের দিকটায়ও গুঞ্জন উঠল। মতিয়ারা ও বোধ হয় শব্দ পেয়েছে। ওপাশের সুধনের টর্চের আলোকে ও ব্যস্ত হতে দেখল। তার পা ভাঙার পর থেকে সে সবার কাছ থেকে একটু তফাতে থাকে। নইলে আবার যদি……। টেলিগ্রাফের লাইন থেকে একটা পাখি ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল। বোধ হয় পেঁচা হবে। কি পেঁচা ওটা? হুতুম না লক্ষ্মী?

একটা ছোট্ট আলোর বিন্দু সুরিয়ার চোখের মধ্যে বড় হচ্ছিল। প্রিয় শব্দটা ছুটে এসে আছড়ে পড়ছিল তার রক্তের ওপর। তার রক্তের মাতনটা বাড়ছিল ক্রমশ। পা ভাঙ্গার পর থেকে কয়লা ধরতে এলেই ক্যামন যেন হয়ে যায়। একটা ভয় তাকে গ্রাস করতে ছুটে আসে। পাতের ওপর দিয়ে দানোটা যত এগিয়ে আসে তার বুকের কাঁপনটাও তত বাড়ে। একটা শীত শীত ভাব তার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসতে থাকে। আর যখন কলমীর ডালটা টেনে নিয়ে কতগুলো কয়লার টুকরো ফেলে গাড়ীটা ছুটে চলে যায়, তখনই তার ঐ ঘোরটা কাটে। একটা আলো তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। কয়লার টুকরোগুলো কুড়োবার জন্য সে মোরগের মতো হয়ে যায়। তার খোঁড়া পা-টাও যেন কিছু সময়ের জন্য স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। সে কয়লাগুলোকে বুকে করে জড়িয়ে ধরে। আসলে কয়লা তো নয়, মানিক—কালো মানিক। আসলে কালোও নয়, ওগুলো তার সোনা মানিক। সকাল বেলায় ওগুলো বেচেই তো তার নিজের, বৌ-এর ছেলেমেয়েদের পেটের আগুন নেভাবার রসদ পায়। তাই যেদিন বাবুদের দয়া হয়, বেশী কয়লা ফ্যালে, সেদিন তাদের মহোৎসব। আর যেদিন বদমাইশ-গুলো টাকা নিয়ে পালায় কয়লা না দিয়েই সেদিন তাদের শিব চতুর্দশী। আসলে পেটের ভেতরের রাক্ষসটার সাথেই তার চিরদিনের লড়াই। সে কেবলই হেরে যায়। কিছুতেই এঁটে উঠতে পারে না। আর ঐ সোনা মানিকই তো তার সেই রাজপুত্তুর। সত্যি সত্যি কি খিদের রাক্ষসটাকে রাজপুত্তুর মেরে ফেলতে পারবে। চিরদিনের জন্য শান্তি। খিদে নেই, চিন্তা নেই। শুধু সে দিনরাত প্রাণ খুলে গান গাইত। একটা পাখির মতো ডানা মেলে দিতে পারত আকাশে। ফুলের মতো হাসতে পারত। তার একটা নৌকোয় পাল তুলে দিয়ে বৌ-ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যেতে পারত স্বর্গের দেশে।

অথচ এই পেটের জন্যই তাকে রাতের আঁধারে বসে থাকতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এই পেটের জন্যই তো তাকে পা-টা হারাতে হয়েছে। এক এক সময় তার ইচ্ছে করে ঐ খিদেটাকে পেট থেকে বের করে এনে টুঁটি টিপে ধরে। ঐ রাক্ষসটাই তার পা-টাকে নিয়েছে। ওর জন্যই সুরিয়া পাতর আজ ল্যাংড়া সুরিয়া। তার অমন তাগড়াই চেহারাটা আজ প্যাকাটির মতো। বাম পা-টা শুকিয়ে দড়ির গাছার মতো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে তার এই জীবনটার ওপর ঘেন্না ধরে যায়। এভাবে কুকুর শেয়ালের মতো বেঁচে থেকে কি লাভ? ঘুম থেকে উঠলেই পেটের চিন্তা। পেটের চিন্তা করতে করতেই আবার ঘুম। তবু এই রেলগাড়ী আছে, রেলগাড়ী থেকে সোনামানিক নেমে আসে তার কোলে। আর সে ই বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে, তার বৌকে, তার ছেলেমেয়েকে। আসলে সারা পাতর পাড়াটাই তো বেঁচে আছে কয়লা ধরার কাজ করে অথচ দিনের পর দিন কয়লার ইঞ্জিন কমে আসছে। বাড়ছে ডিজেল ইঞ্জিন। সেদিন কে যেন বলছিল সরকার নাকি কয়লা ইঞ্জিন একদম তুলে দিবে। কথাটা শোনা অবধি সুরিয়ার কপালে ভাঁজ গাঢ় হয়ে উঠেছে। কয়লা না ধরতে পারলে সে খাবে কি? তার বৌ-ছেলেমেয়েকে সে কি খেতে দিবে? সারা পাতর পাড়াটারই বা কি হবে? সেই ছোটবেলা থেকে তারা ইঞ্জিন থেকে কয়লা ধরে আসছে, আজ কয়লা ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে তাদের কি হবে? সুরিয়া ভেবে পায় না কে এই দুর্বুদ্ধিটা সরকারকে দিয়েছে? তাদের কি ঘরে ছেলেপুলে নাই? ক'টা লোক যদি কয়লা ধরে খায়, কি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তাদের? সে মনে মনে গালাগাল দেয় তার অদৃশ্য শত্রুদের। আর বারবার ভাবে সত্যিই যদি সেরকম দিন আসে তবে কি করবে সে? অনেক ভেবে ও সে ঠাহর করতে পারে না। শুধু বুঝতে পারে বুকের দুপদুপানিটা আরও জোরে জোরে হতে শুরু করেছে।

ওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছে। তার এই সব নানান চিন্তাগুলোকে ছাড়িয়ে মাথার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে শব্দটা। আলোর ঢেউগুলো এসে তার সারা গায়ে আছড়ে পড়ছে। সুরিয়া বুঝতে পারল আর কয়েক লহমা পরেই তার পাশ দিয়ে ছুটে চলে যাবে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো গাড়ীটা। সে কলমীর ডালটাকে শক্ত করে ওপরের দিকে ধরে রাখল। একটু এদিক ওদিক যেন না হয়। ফায়ারম্যান যেন ছোঁ মেরে তুলে নিতে পারে টাকা গোঁজা ডালটা। কিন্তু কিছুতেই সে তার পা-দুটোর উপর শরীরটাকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারছে না। পা দু'টো কাঁপছে

—কাঁপছে বুক—সারা শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। যদি সেই সেদিনের মতো হয়। সেদিন ও কয়লা ফেলতে ফেলতে ছুটে আসছিল গাড়ীটা। ধনিয়া টাকা গোঁজা ডালটা বাড়িয়ে দিয়েছে। কয়লা পড়ছে। বেলচা দিয়ে কয়লার চাঙড়গুলো ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে ফায়ারম্যান। এবার তার পালা। সে ধরে আছে ডালটা। ইঞ্জিনটা পেঁছে গেছে তার কাছে একদম। আর সেই মুহূর্তেই প্রায় আধ-মণ খানেকের একটা চাঙড় নেমে এসেছিল তার সামনের দিকে বাড়ানো বাম পা-টার ওপর। গড়িয়ে পড়ে যেতে যেতে সে একটা অসহ্য যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারেনি। পা-টা থেকে একটা তীব্র ব্যথা উঠে আসছিল বুকের মধ্যে। এই যন্ত্রণা ছাড়া চার দিকের চিৎকার-চেঁচামেচি, তাকে দোলায় চাপানো, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া—এসব কিছুই তার মাথায় পেঁছাতে পারে নি। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠেছে সে। আর ছটপট করেছে ডাঙায় তোলা মাছের মতো। আর তারপর পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে চুপচাপ ঘরে বসে রয়েছে দীর্ঘদিন। চুপচাপ বসে থাকার যন্ত্রণা, খিদের যন্ত্রণা, বৌ-ছেলেমেয়েদের না খেতে দিতে পারার যন্ত্রণা—হরেক রকম যন্ত্রণা তার বুকটাকে কুরে কুরে খেয়েছে। বউটা ঘেঁসের গাদা থেকে কয়লার ছোট ছোট টুকরোগুলোকে বেছে বাজারে নিয়ে যেত বেচতে। যে ক'টা পয়সা হতো—সেটাই ছিল তাদের প্রাণের রসদ। আঁধার রাতগুলো যেমন বেশী লম্বা বলে মনে হয়, তার ও সেই দিনগুলোকে তেমনি মনে হতো। তবু একদিন তার পায়ের প্লাস্টার খোলা হল। কিন্তু পা-টা আর কোনদিন আগের মতো হয়ে ওঠে নি। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন, ভাঙ্গা হাড়টা নাকি ঠিক মতো বসানো হয় নি। ঠিক মতো বসাতে হলে, আবার ফটো তুলতে হবে। অপারেশন করতে হবে। বড় হাসপাতালে যেতে হবে। মেলা খরচ। এত টাকা সে কোথায় পাবে? সুতরাং সুরিয়া পাতর আর সে রইল না, ল্যাংড়া সুরিয়া হয়ে গেল ক্রমে ক্রমে। এই কয়লা ধরার কাজটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল একটা জ্বলন্ত রাগ বুকে নিয়ে। টের পাচ্ছিল একটা গভীর ভালো-বাসা বুকের ভেতর জমে উঠছে তার দু'টো হাত আর বাকী একটা পায়ের জন্য। কিন্তু কি কাজ করবে সে? এই ল্যাংড়া পায়ে আর কি করতে পারে। পেটের ভেতরের রাক্ষসটা যে বড় বেশী শয়তান। তার হাত থেকে ছাড়ান নাই কিছুতেই। সুরিয়া পাঁচটা টাকা ধার করে আবার বেরিয়ে এসেছিল রেলের রাস্তার দিকে। বউটা কপালে হাত ঠেকিয়ে বিড় বিড় করে ঠাকুরের কাছে তার মঙ্গল কামনা

করেছিল। আর সে রক্তের ভেতর শীত শীত ভাবটাকে এড়ানোর জন্য গান গাইতে চাইছিল সেই অন্ধকারের ভেতরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু টাকা গোঁজা ডালটা বাড়িয়ে দেওয়ার সময় পর্যন্ত এই শীতটাকে সে কিছুতেই আর তাড়াতে পারে না। বুকের আওয়াজটা কান তক উঠে আসে। ক্যামন যেন সে ফ্যাকাসে হয়ে যায় এ সময় প্রতিদিন।

সুরিয়ার হঠাৎ খেয়াল হলো এখনও সে টাকা গোঁজা ডালটা হাতে নিয়ে লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক দূরে কোথায় যেন চলে গেছিল সে। কিন্তু গাড়ীটার কি হলো? পেরিয়ে চলে গেছে কি? নিজের ওপর প্রচন্ড রাগ হচ্ছিল তার। কেন সে এ সময় এত আনমনা হল? ওর ভয় পাওয়া চোখ দু'টো আঁধারের ভেতর দিয়েই এদিক ওদিক ছুটে যেতে লাগল। ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে গাড়ীটা একটু আগেই। তার চোখের মণি দুটো আলো ফিরে পাচ্ছিল ক্রমশ। গাড়ীটা না গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে কেন? সিগন্যাল পায় নি কি? সুরিয়া খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল সেই দিকে। চমকে উঠল সে। এ কি! ওরা সব কি করছে! এত কয়লা। হাফ-ওয়াগনটার ওপরে কে কে যেন উঠে গেছে। চূড় হয়ে থাকা কয়লাগুলোকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে তারা। আর নীচে জড় হওয়া মানুষগুলো পাগলের মতো কয়লা ভরছে বস্তায়। পাড়ার দিক থেকে আরো লোক ছুটে আসছে। কয়লা লুট হচ্ছে। যে যেদিকে পারছে নিয়ে পালাচ্ছে। সুরিয়ার গা দিয়ে ঘাম ঝরে পড়তে লাগল। সে বুঝতে পারছিল তার রক্তের ভেতর একটা বড় শুরু হয়ে গেছে। ঝড়ের দাপটে সব ওলট পালট করে দিচ্ছে যেন। চোখ দু'টোয় আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়লার টুকরোগুলোর ওপর। দু'হাতে বস্তাটায় টুকরোগুলোকে পুরে ফেলতে লাগল। তাকে অনেক কয়লা বয়ে নিয়ে যেতে হবে। অনেক—অনেক—। অনেক টাকা পাবে সে। আসলে কয়লা মানেই তো টাকা। আর টাকা মানেই তো পেট পুরে খাওয়া, পরনে নতুন কাপড়, ঘরের চালের ছাঁদা গুলোয় নতুন খড়ের গোঁজা। আ! এত সুখ তার! সে কি পাগল হয়ে যাবে? যদি টহলদারী রেল পুলিশ এসে পড়ে এক্ষুণি! সুরিয়া আরো জোরে হাত চালাতে লাগল। ভরে গেছে বস্তাটা এবার। ক্ষ্যাপা মোষের শক্তিতে টেনে নিয়ে যেতে লাগল বস্তাটা। তার খোঁড়া পা-টাও যেন এখন ভালো হয়ে গেছে। পায়ের যন্ত্রণার কথা ভুলে যেতে পারছিল সে। ভুলে যেতে পারছিল নিজের অপুষ্টির

শরীরটার কথা। তার দু'চোখ জুড়ে ছিল শুধু কয়লা। দু'কান ভরে ছিল টাকার মিষ্টি গান। একটা আশ্চর্য আলো ছড়িয়ে পড়েছিল তার রক্তের ভেতর। ধানের ক্ষেতের আল দিয়ে বস্তাটাকে টানতে টানতে ছুটছিল সে। সামনের উ'চু আলটা পেরুতে পারলেই আপাতত নিরাপদ। ওর পেছনেই লুকিয়ে রাখবে বস্তাটাকে। কিন্তু বস্তাটাকে কিছুতেই ওঠাতে পারছিল না আলটার ওপর। তার সমস্ত শক্তি যেন শেষ হয়ে আসছে। হঠাৎ ফিরে পাওয়া শক্তিটা যেন হঠাৎ-ই সে হারিয়ে ফেলছে। কিন্তু তাকে তো বস্তাটাকে ওপাশে নিয়ে যেতে হবেই। নইলে...। নিজের শরীরটাকেই যেন সে চাবকে চাঙা করতে চাইল। মরীয়া হয়ে টানতে লাগলো বস্তাটাকে। জোরে আরো জোরে, সমস্ত শক্তি দু'টো হাতে জড়ো করে হ্যাঁচকা টান মারলো সে বস্তাটায়। পুরোনো বস্তাটা মাটির ঘষায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ অবস্থায় পে'ছে ছিল এসে। হঠাৎ টানে ফে'সে দু ভাগ হয়ে গেল। সুরিয়া ছিটকে পড়ল আলের ওপাশে। যন্ত্রণায় ক'কিয়ে উঠল। ল্যাংড়া পা-টার ব্যথা তীব্র ভাবে তাকে বিদ্ধ করতে লাগল। উঠে দাঁড়াবার শক্তি ও যেন সে হারিয়ে ফেলেছিল! কিন্তু তবু কে যেন তার বুকের ভেতর থেকে তাকে খু'চিয়ে জাগিয়ে তুলল। বুকের ওপর ভর দিয়েই সে এগিয়ে যেতে লাগলো ছড়িয়ে যাওয়া কয়লাগুলোর দিকে। ছড়ানো কয়লাগুলোকে দু'হাতে জড় করতে লাগলো। পারলে যেন বুকে ভেতরে পুরে ফেলে। রেল পুলিশ কি এখান পর্য্যন্ত চলে আসবে? তারা কি সমস্ত কয়লা তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে? সে আরো ও জোরে বুকের ওপর কয়লা গুলোকে চেপে ধরল। পারলে যেন নিজেকে মিলিয়ে দেবে তার কালো মানিকের সাথে। এগুলো তার। সে কাউকে দিবে না বে'চে থাকতে থাকতে। তার সমস্ত রক্তই যেন চিৎকার করে উঠছিল—আমার আমার।

সুরিয়ার কালো দেহটা কয়লার টুকরোগুলোর ওপর ওগুলোকে জড়িয়ে ধরে অন্ধকারের ভেতর স্থির হয়ে রইল। অন্ধকার রাত্রির মাঝে তার বুকের ভেতর তখন শুধু ছোট একটা আলোর বিন্দু। একটা মিঠে শব্দ। এই আলো এই শব্দ গান হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছিল তার রক্তের ভেতর।

## নদীর দিকে

বড় রাস্তা থেকে নিজের গলিটার মধ্যে নেমে এল মন্দাকিনী। এতক্ষণে সে যেন বুক ভরে শ্বাস নিতে পারল। বুকে তীর বিঁধিয়ে দেওয়া হাসির ঢেউ আর তাকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল না। এই গলিটায় আর সে বেমানান নয়। এখানে সে একান্ত আপনার। ঐ আলো ঝলকানো বড় রাস্তা আর দু'পাশের পাকা বাড়ীগুলোকে ক্যামন যেন মাঝে মাঝে বড় অচেনা মনে হয় তার। মনে হয় বুকের ওপর চেপে বসতে চাইছে সব। এই গলির আঁধারে অনেকটা হালকা মনে হয় নিজেকে। এই যে আলোছায়া, এই যে পচাটে গন্ধ, এই যে কাল-শালিকের মতো এখান ওখান থেকে খুঁটে আনা এটা-ওটা দিয়ে তৈরী আস্তানা—এসব তো তার প্রতিদিনের চেনা। রক্তের মধ্যে ঢুকে গেছে যেন। এসব ছাড়া তো তার নিজের কোন আলাদা অস্তিত্ব নেই। এখানকার বাসিন্দাদের সাথে সে বেমালুম মিশে যেতে পারে। নিজেকে ছোট মনে হয় না ময়লা কাপড়টার জন্য, খড়ি পড়া খসখসে কালো চামড়ার শরীরটার জন্য, একমাথা শনের গোছার মতো চুলের জন্য। মনের মধ্যে লোভের সাপটা ফোঁস করে ছোবলায় না—শান্ত হয়ে বুকের ঝাঁপিতে ঘুমিয়ে থাকে। সে যদিও ভুলে থাকতে পারে না যে একসময় সে একজন আহ্লাদী কৃষাণী ছিল। সুবর্ণরেখার তীরে এক সবুজ গাঁয়ে ছিল তার খড়ে ছাওয়া গোবরে নিকানো মাটির ঘর। নদীর মতো শরীরের একজন মানুষকে নিয়ে তার ঋতুচক্র। আকাশের চাঁদনী আর মেঘের মতো তাদের হাসি-কান্নার জীবন। এসবের মাঝেই তো সে ডুবেছিল দীর্ঘ সময়। এই বস্তির ছোট্ট ঘরটার মধ্যে সে এইসব উজ্জ্বল স্মৃতিগুলোকে এখনও ধরে রাখতে পেরেছে। আর এগুলোই যদি বুকের ভেতর থেকে দূরে সরে যায় তবে তার জীবনের অবশিষ্টই বা কি থাকে? ওরা তাকে 'মিথ্যেবাদিনী মন্দাকিনী' বলুক, যত পারুক মুখ ঘুরিয়ে হাসুক। উপহাস করুক। তবু সে জানে তার

এখনকার এই শ্রমিক বউ-এর জীবন যেমন সত্য তেমনি সত্য তার ফেলে আসা গাঁয়ের সবুজ জীবনের ছবি। তার সেই সুখ, সেই শান্তির খবর ক'জন জানে? গনগনে রোদের নীচে লাঙলের বোঁটা দু'হাতে চেপে ধরে যে লোকটা মা-ধরিত্রীকে ঋতুমতী করে তোলে, তার জন্য ছেলের হাতে শাকের ভাজা আর পান্তা পাঠিয়ে দেওয়ার মাঝে যে কী সুখ, তার স্বাদ কি ঐ বড়বড় বাড়ীগুলোর শরীর নিয়ে পড়ে থাকা বৌগুলো কখনো পেয়েছে? পেয়েছে সুবর্ণরেখার হিম জলে গলা ডুবিয়ে হাঁসের মতো সাঁতার কাটার আনন্দ? বিউলির ডাল, কুমড়ো-পুঁইয়ের ঘণ্ট, কাঁচা আম দিয়ে রাঁধা মৌরলা মাছের টক আর গরম গরম ভাত বেড়ে দিয়ে তালপাতার পাখায় হাওয়া করতে করতে কখনো স্বামীকে খাইয়েছে ওরা? কোলে একটা বাচ্চাকে নিয়ে একহাতে উনুনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে অপর হাতে পিছু দিয়ে হাঁড়ির গরম বালিতে চাল নেড়ে নেড়ে মুড়ি ভেজেছে কোন দিন? তবু তাকে ওরা তার অতীত জীবনের কথা বলার জন্য উস্কে দিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসবে। তার এই সুখের দিনের কথাগুলো তো মিথ্যে নয়। তবু কেন ওরা তাকে 'মিথ্যেবাদিনী' বলবে। বাবুদের বাড়ীতে ঝি-এর কাজ করে বলে কি তার আত্মসম্মান নেই? যে মানুষটা একদিন কত দীনদুখীকে থালাভরা ভাত খাইয়েছে সে আজ ক্যামন করে বাবুদের বেশী হওয়া খাওয়ার নিজের জন্য, নিজের ছেলে-মেয়েদের জন্য, বাড়ী নিয়ে যাবে! সে তো ভিখারী নয়। কি করে সে ভুলবে নিজেকে। মন্দাকিনী কিছুতেই পারে না—নিজের ছেলে-মেয়েদের খিদেয় রেখে ও পারে না। বলুক, ওরা যত পারে তার রোদ ঝলমল অতীতটার কথা শুনে 'মিথ্যেবাদিনী মন্দাকিনী', 'লাটসাহেবের গিন্নী' বলে নিজেরা আনন্দ পাক। তবু সে তার পা দু'টোর ওপর নিজের শরীরটাকে খাড়া রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবে।

কিন্তু মাঝে মাঝে মাঝে এই সব মানুষগুলোর মধ্যে, তাদের এই হাসির মধ্যে সে যেন ক্যামন হয়ে যায়। কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। তার চোখ দু'টোর পাতার নীচ থেকে গরম ভাপ উঠে আসে। সে জানে ঐ উঁচু পাঁচিল ঘেরা বড় বড় বাড়ীগুলোয় তার চোখ ভিজে ওঠা বেমানান—অর্থহীন। শত শত সুচ সারা গায়ে বিঁধে গেলেও নিজেকে শক্ত করে ধরে রাখা দরকার। সে বুকের গভীরে জড়িয়ে রাখতে চায় এক নদীকে—চোখের ভেতরে ধরে রাখতে চায় এক

সবুজ দ্বীপকে। কতবার সে এ-ঘরে কাজ ছেড়ে ও ঘরে ধরেছে। কতবার ভেবেছে আর ঝিগিরি করবে না। কিন্তু বছরে দশমাস কাজ পাওয়া কাচকল শ্রমিকের স্ত্রী কি ঝি-এর কাজ না করে থাকতে পারে ?

আজ নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে হচ্ছিল মন্দাকিনীর। তার মাথাটাকে ঘাড়ের ওপর শক্ত করে ধরে রাখার ক্ষমতাই যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। চোখের ভেতরের গরম ভাপটা এখন তরল হয়ে ঝরে পড়ছে। তবে এখানে তার কাঁদতে বাধা নেই। কান্না এই আঁধার গলিতে বেমনান নয়। এ জায়গা তো তার আপনার। এখানে সে প্রাণ ভরে কেঁদে পেতে পারে নিজের বুক হালকা করার শান্তি। এখানকার গাঢ় আঁধার আর তার মাঝে মুমূর্ষু আলোর শিখাগুলোর মধ্যে খুঁজে পায় নিজের জীবন। তার বুকের মাঝে জোনাকীর মতো আলোর শিখা রয়েছে বলেই তো সে এখনো বেঁচে আছে—জুঝছে অমাবস্যার পৃথিবীটার সাথে। বুকের ভিতর ভারী হয়ে আসা বাতাসগুলোকে সে বাইরের বাতাসের সাথে মিশিয়ে দিল। নিজের মনেই বিড় বিড় করল সে, 'জুঝছি! হায়, জুঝেই যাচ্ছি আমি!' সে ডান হাতটা রাখলো বুকের ওপর—শুকিয়ে আসা স্তন দু'টোর মাঝখানে, আর বাম হাতের আঙুলের উল্টো পিঠ দিয়ে গাল বেয়ে নেমে আসা জলকে চেঁছে ছুঁড়ে দিল দূরে—আঁধারের বুকে।

কুকুরটা খ্যাঁক করে করুণ ভাবে ডেকে উঠতেই মন্দাকিনী লাফিয়ে সরে এলো, বুঝতে পারল পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে ওর লেজ। ক্রুদ্ধ ঘেউ ঘেউ ডাক সরে গেল দূরে। যে আবার চলতে লাগলো, মনে মনে প্রশংসা করল কুকুরটার এভাবে খেঁকিয়ে ওঠার জন্য। কিন্তু কামড়ালো না কেন? মন্দাকিনীর বুকটা খচ্ করে উঠল। সে ঘামতে লাগলো, বুকের শব্দটাও কি সে টের পাচ্ছে? সে কি শেকলে বাঁধা কুকুরগুলোর মতো হয়ে যাবে? সে কি তার শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি টিপে ধরার সাহস পাবে?

নিজেকে বেশ ক্লান্ত মনে হচ্ছিল মন্দাকিনীর। নিজের ছোট্ট ঘরটায় সেই একই দৃশ্য। বড় ছেলেটা আলোর চেয়ে বেশী ধোঁয়া ওগরানো লম্ফের কাছে বই মেলে ধরে পড়ছে। পাশে শুয়ে আছে ছোট মেয়েটা আর তারই পাশে আঁধারের দিকে চেয়ে বসে আছে তার দীর্ঘ সময়ের চেনা লোকটা—যার সবুজ মনটা কারখানার চুল্লীর আঁচে আজ হলুদ। মন্দাকিনীর বুকের ভিতরে বাতাস স্থির হয়ে আসে। হেমন্তের দৃষ্টি ছোঁয় ওর শরীর। ক্যামন যেন অচেনা

ঠেকে চেনা মানুষটাকে। মন্দাকিনী বুকের বাতাসকে ছড়িয়ে দেয় ধীরে ধীরে আঁধারের ভেতর। আঁচলটা দিয়ে মেয়েটার গায়ে বসা মশাগুলোকে তাড়ায়। লোকটা অন্ধকারের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল কেন? ও কার স্বর? জমি জিরেত হারালে কৃষকের স্বর শ্রমিকের হয়ে যায়। আর শ্রমিকের কাজ চলে গেলে! সে স্বর কেমন হয়?

'আজ ভাত বেশী হয়নি বাবুদের?'

মন্দাকিনীর বুক কাঁপে। কেন এত যুদ্ধ তার বুকে?

'হ্যাঁ।'

'তবে আনলে না যে বড়?'

ছেলেটারও পড়া বন্ধ হয়ে যায়। দৃষ্টি মার দিকে স্থির।

মন্দাকিনী চেয়ে থাকে মেয়েটার ঘুমন্ত শরীরের দিকে। মশাগুলো ঘুরে ফিরে আসে। কত মশা তাড়াবে সে!

'তোমার কিসের এত মান-সম্মান? মান-সম্মান ধুয়ে খেলে কি পেট ভরবে?'

মন্দাকিনী দেখে লম্ফটার আলো ক্রমে কমে আসছে, বাড়ছে ধোঁয়া। ছ'মাস পরে ছেলেটা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে। আজ থেকে দশদিন পরে ওর বাবার কারখানা আবার চলবে। আর তার ও সাতদিন পরে ঘরে ফিরবে হপ্তা নিয়ে। মাত্র তো সতেরটা দিন। কিন্তু কখনো কখনো দিনগুলো এত বেশী বড় হয়ে যায় কেন?

'কথা বলছ না যে বড়। আমরা এখন আর চাষী নই বুঝলে। জমি নেই, হাল নেই···আর এখন কলের কাজটাও···'

লোকটা হঠাৎ থেমে গেল কেন? ও কি অনেক দূরে সরে যাচ্ছে? মন্দাকিনী ওঠে। উনুনটা ধরায়। স্টেশনের পাশের ঘেঁসের গাদা থেকে খুঁটে খুঁটে আনা কয়লার টুকরোয় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। হাঁড়িতে শোঁ শোঁ করে গরম হয় করপোরেশনের জল। এক মুঠো এক মুঠো করে জমানো চালের সঞ্চয় শূন্য হয় হাঁড়ির জলে এসে। টগবগ করে চালগুলো ছোটাছুটি করে ভাত হতে থাকে। বড় ছেলেটা চোখ ডলে। উঠে এসে ঢক ঢক করে জল খায় ঘটি থেকে। মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বলে, 'বড্ড খিদে পেয়েছে মা।'

মন্দাকিনীর আধখানা মুখ উনুনের আঁচে ঝলকায় আর আধখানাকে সে অন্ধকারে ঢেকে রাখে।

'আর একটু, হয়ে এলো বলে।'

'লম্ফে তেল নেই মা।'

'তা আমি কি করব? বাবাকে বলতে পারিস না?' কথাটা প্রায় উঠে এসেছিল গলা পর্যন্ত। কোন রকমে দাঁতে ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলে নেয় মন্দাকিনী। অন্ধকার আর লোকটার মধ্যে এখন কোন তফাৎ নেই। কি হবে মানুষটার আর একটু রক্ত ঝরিয়ে।

মন্দাকিনী মাথার রগ দু'টো ডান হাতের আঙ্গুল গুলো দিয়ে টিপে ধরল। বিকেলের মৃদু যন্ত্রণাটা বেশ চাগিয়ে উঠেছে এখন। কেন যে বড় ছেলেটা এত ভালো হল। খেতে পায় না, পরতে পায় না ঠিক মতো তবু দিনরাত বই মুখে নিয়ে বসে আছে। বস্তির ছেলে হয়েও স্বপ্ন ধরে রেখেছে চোখে। অথচ মেজোটা ঠিক এখানকার মতোই। বোধহয় সে-ই ঠিক করেছে। হোটেলের এঁটো থালা ধোয়। মালিকের চড়-চাপড় খায়। আবার মাছটা-মাংসটা ও খেতে পাচ্ছে।মাঝে মাঝে বুকে-পিঠে ছাপমারা গেঞ্জি আর সস্তায় কেনা পুরোনো প্যান্ট পরে রাতের শো-তে সিনেমা দেখতে যায়। বাড়ীতে আসে না আদৌ। টাকা ও দেয় না। তার বাপ চাইতে গেছিল সেদিন। বলেছে, 'তোমাদের রাক্ষুসে পেটে তো সব ঢুকে যাবে। আমার ভবিষ্যৎ নেই?' বেশ বুদ্ধি হয়েছে ছেলেটার। 'তুই বাঁচবিরে, ঠিক বাঁচবি। মরবে ওই বড় খোকাটা। ও যে বুকের ভিতর অনেক ভালোবাসা লুকিয়ে রেখেছে, চোখের মধ্যে ধরে রেখেছে স্বপ্নের আলো। তুই এত ভালো হোসনি খোকা, তুই মরবি।' মন্দাকিনী নিজেকেই নিঃশব্দে শোনায় এসব। তার বুকটা ভেজা কাপড়ের জল নিঙড়ানোর মতো করে মোচড় দিয়ে ওঠে। সে তাড়াতাড়ি হাঁড়ির ঢাকা খুলে খুরপি দিয়ে ভাত দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নামিয়ে আনে হাঁড়িটা। ফ্যান না গেলেই দু'ঘটি জল ঢেলে দেয় তাতে। একটা আধশুকনো বেগুন শিকে ফুঁড়ে পোড়াতে দেয় উনুনে। দপ্ করে লম্ফটা নিবে গেল। ভালোই হলো। তার মনে হলো, 'এই বোধহয় ভালো। অন্ধকারেই ভালো মানায় এক চাটু জল ঢালা ভাত আর এক ফোঁটা বেগুন পোড়া।'

মন্দাকিনী নাড়া দিয়ে মেয়েটার ঘুম ভাঙায়। উঠতে চায় না প্রথমে।

কাঁদে। খিদেয় একদম নেতিয়ে পড়েছে বেচারী। এটা-ওটা বলে ভোলায় ওকে।
বড় খুকীকে ও ঠিক এমনিভাবে সে জাগিয়ে তুলতো। সহজে উঠতে চাইতে না।
প্রথম সন্তান। কত আদর তার। দুধ খাওয়ানোর জন্য কত মেহনত করতে
হতো। তখন নিজের ঘরের গাই-এর দুধ। অথচ খেতেই চাইতো না মোটে।
মাছ ছাড়া মুখে ভাত তুলতো না। সাত-আট বছর পর্যন্ত নিজের হাতে খায়
নি কখনো। আজ সেই মেয়ে শশুর বাড়ীর ঘানি টেনে চলেছে রাত দিন।
ঠিক মতো খাওয়া-পরা জোটে না। তার উপর বকুনি পিটুনি লেগেই রয়েছে।
এত দেখে শুনে বিয়ে দিয়ে কি লাভ হলো? কি লাভ হলো তিন বিঘা জমি
বিক্রি করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে?

মন্দাকিনী যেন অনেক দূরে চলে যায়। ফেলে আসা সময়গুলো সামনে
এসে দাঁড়ায়। সুবর্ণরেখার মায়াবী গান বুকের ভেতরে যেন বাজতে থাকে। আর
ঠিক তখনি দেখতে পায় আর এক সুবর্ণরেখাকে। ওর মা-কালীর মতো টকটকে
লাল জিভটাকে। মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে যে সংসারে সুখ পিছু হটতে শুরু
করেছিল, শেষ জমিটুকু পেটে পুরে তাকে তো ঐ সুবর্ণরেখাই ছিন্নমূল করে
দিয়েছে। কেন এমন হল? সে ভেবেছে অনেক। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারে
নি সে কি অনেক পাপ করেছে? অনেক পাপ—অনেক, অনেক। জমি-
জিরেত হারিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে হয় কত পাপ করলে! অথচ তার যে
একদিন ঘর-বাড়ী ছিল, জমি-জিরেত—চাষ-বাস ছিল, ছিল ঘরের গরুর দুধ—
পুকুরে মাছ—গাছে আম-কাঁঠাল—এসব ওরা বিশ্বাস করে না। প্রায় প্রতিদিনই
যে তার ঘরে ভাট-ভিখারী, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের দু'-এক পাত পড়ত এবং উচ্ছিষ্ট
খাওয়ার নয়—নিজে না খেয়ে ও কতদিন সে এদের খাইয়েছে, এসব বললে ওরা
মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে হাসি চাপে। আড়ালে তাকে 'মিথ্যেবাদিনী মন্দাকিনী' বলে
ডাকে। সে এসব সহ্য করবে কেন? ওরা কতটুকু জানে তাকে? কতটুকু
দেখেছে? তার ঘরে অভাব থাকতে পারে, তাই বলে কি সে ভিখারী? তার
সম্মানবোধ থাকতে নেই? সে তার এই সম্মানটুকুকে আঁকড়ে ধরেই তো এতদিন
নিজের পা দুটোকে শক্ত করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। কিন্তু আজ।
ঘরের লোকটাও যদি অভাবে-দুঃখে নিজেকে হারিয়ে ফেলে তবে সে কাকে নিয়ে
জুঝবে?

মন্দাকিনীর এসব ভাবনাগুলো ঘুরে ফিরে এসে দখল করে তাকে, তার

মাথাটা প্রায়ই ধরে থাকে আজকাল। মাঝে মাঝে তার মনে হয় সত্যিই সে হেরে যাবে। ভয় হয়। আর তখনই সে দু'টো হাত দিয়ে নিজের বুকটাকে জড়িয়ে ধরে। চিৎকার করে উঠতে চায় 'না না না'।

জ্যোৎস্নার আলোটা তেরছা হয়ে এসে পড়েছে দাওয়ার ওপর। সেই আলোতেই ছেলে মেয়ে দু'টোকে বেড়ে দেয় জল ঢালা ভাত আর বেগুন পোড়া। ঠিক মতো ঠান্ডা হয়নি এখনও। তবু ওরা চেটে পুটে খেয়ে ফেলে। মন্দাকিনী ছেলেমেয়েদের মুখ দেখে আর দেখে হাঁড়ির ভেতরটা। কিছুতেই আটকে রাখতে পারেনা বুকের বাতাসটাকে। আর একটু করে জল সহ ভাত দেয় ওদের। বড়টা মুখে 'না' বলে, আর দেওয়ার পর গপ্‌গপ্‌ করে খেতে শুরু করে। মন্দাকিনীর দৃষ্টি জ্যোৎস্নার আলোর সাথে মিশে জ্যোৎস্না হয়ে যায়।

ছেলে আর মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। মন্দাকিনীর মাথায় ঘুরে ফিরে পুরনো ভাবনাগুলোই নতুন করে জড় হয়। ঢং ঢং করে বড় রাস্তার কোন বাড়ী থেকে দশটা বাজার শব্দ ভেসে আসে। গলি দিয়ে মাতাল রিক্সাওয়ালা রহিম গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরছে। এখুনি ওদের বাড়ী থেকে চিৎকার চেঁচামেচির শব্দ ভেসে আসবে। ওর বউটা রোজ দাওয়ায় বসে থাকে ওর জন্য। আর প্রায় রোজই মার খায় ওর হাতে। মন্দাকিনী নিজেকে যতটা পারে জ্যোৎস্নার মতো করে তোলার চেষ্টা করে।

'খাবে এস, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

লোকটা বসেই থাকে। পিঠে বসা মশাগুলোকে মারার চেষ্টা করে। মন্দাকিনী নিজেকে আরও ছড়িয়ে দেয়, স্নিগ্ধতা মেশায়।

'আর রাগ করতে হবে না। ওঠ এবার, চাট্টি ভাত আছে খেয়ে নাও।'

এবার মানুষটাকে নড়েচড়ে বসতে দেখে সে। ভাষাহীন, নিরুত্তর। মন্দাকিনী ওর কাছে গিয়ে হাত রাখে কাঁধের ওপর। বহু চেনা স্পর্শ হাত দিয়ে উঠে আসে বুকে। সে শুনতে পায় পরিচিত স্বর। অন্ধকার থেকে যেন উঠে আসে শব্দগুলো।

'এভাবে আর কতদিন চলবে। এখনও তো অনেকদিন বাকী। ভেবেছ কি করে চলবে এতগুলো পেট ?'

'সে হবেক্ষণ। তোমাকে এত ভাবতে হবে না। খাবে এসো।' মন্দাকিনী মানুষটাকে টেনেই তোলে। দু'জনে নিঃশব্দে কয়েক গ্রাস ভাত আর এক জাম

করে ভাতের জল খায়। চাঁদ ক্রমশ সরে যায় পশ্চিমে। আলো দাওয়া থেকে নেমে আসে পথে। চারদিক শুনশান হয়। মাঝে মাঝে সেই নিস্তব্ধতা ভাঙে কুকুরের চিৎকার। কখনও বা রেলগাড়ীর গর্জন।

মন্দাকিনীর চোখে ঘুম আসে না। ওপাশের মানুষটা কি ঘুমিয়েছে? শ্রমিকের কাজ চলে গেলে তারা কি রাতে ঘুমাতে পারে? সে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায় নিজের চিন্তার ধরন দেখে। সত্যিই সে পাল্টে গেছে। অনেক অনেক কথা অন্য রকম করে ভাবতে পারে আজকাল। এ ভাবনা তো একজন কৃষাণীর নয়। তবে এখন সে কি? সে কি এখন বাবুদের বাড়ীর বেশী হওয়া খাওয়ার নিয়ে আসতে পারে? সে কি সত্যিই লোকের বাড়ীর এঁটো বাসন মাজা ঝি হয়ে গেছে? হতে পেরেছে? ওর চোখে ঘুম আসে না। মাথাটায় আরও বেশী করে যন্ত্রণা টের পায়। বুকের ভেতরও একটা কাঠ ঠোকরা ঠুকরে চলে অনবরত। সে বুঝতে পারে তার বুকে রক্ত ঝরছে। অথচ সে রক্ত কাউকে দেখানো যায় না। ঘরের মানুষটাও যেন তাকে বুঝতে পারে না আজকাল। একজন ভূমিহারা কৃষক আর একজন কাজ হারানো শ্রমিকে কি তফাৎ আছে? সে ভাবতে পারে না আর। ঘুমের দেবীর কাছে নতজানু হয়। যেন ঘুম নেবে আসে তার চোখে অনন্তকালের জন্য। আকাশের চাঁদনী, অসংখ্য তারার জ্যোতি—সব ছাড়িয়ে শুধু আঁধার নেবে আসুক তার দু'চোখ জুড়ে।

তবু তার ঘুম আসে না। একটা শব্দ যেন বেজে চলে কল্ কল্, ছল্ ছল্। একটা নদী—হিমহিম জল—কাচ রঙা। সে যেন ইচ্ছে করলেই সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে নিতে পারে সেই জলে। অনেকগুলো চেনা মুখের ছায়া এসে পড়ে তার বন্ধ চোখে। অনেক হাসি, অনেক কান্না ধরা দিতে না দিতেই হারিয়ে যায় আঁধারে। মন্দাকিনী আর ধরে রাখতে পারেনা নিজেকে বিছানায়। দাওয়া থেকে নেমে আসে। মেঘের আঁচলার মধ্য থেকে চাঁদের হাসি আলোতে ঝরে ঝরে এসে পড়ে তার গায়ে। সব কিছু ভুলে যেতে ইচ্ছে করে তার। চলে যেতে ইচ্ছে করে ছোটবেলার জগতে। সে কি পারে না এক, দুই, তিন······করে আকাশের তারা গোনার আনন্দে মেতে যেতে! সুবর্ণরেখার জলে ঝোলা জাল নিয়ে মাছ ধরার নাম করে দাপিয়ে বেড়াতে! সে কি পারে যৌবনের দিনগুলোতে ফিরে যেতে। কত রাত তো তারা কাটিয়েছে ঘাসের উপর দু'জনে পাশাপাশি শুয়ে। দাওয়ায় শুয়ে থাকা এখনকার মানুষটা কি আগের সেই

জগতে ফিরে যেতে পারে ? সেও কি পারবে ?

নিজের বুকের মধ্যে প্রশ্নটা ঝুলে থাকে তার। সে বুঝতে পারে হঠাৎ যেন তার রক্তের ভিতর দিয়ে একটা হিমস্রোত বয়ে যাচ্ছে। কি যেন এসে আটকে থাকে গলায়। গালের উপর দিয়ে গরম জলের ধারা নীচের দিকে নেমে আসে। মন্দাকিনীর মনে হয় সে হেরে যাচ্ছে। তার চুরি হয়ে গেছে অনেক কিছু। বুকের ভেতর জমানো নক্সিকাটা লক্ষ্মীর ঝাঁপিটাকে কারা যেন চুরি করে নিয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা সে আর। পা দুটো কেঁপে যায়। মাটির উপর নিজেকে ছড়িয়ে দেয়। মাটির গভীরে যেন লুকিয়ে ফেলতে চায় নিজের মুখ। এমন সময় পিঠের উপর একটা পরিচিত হাতের স্পর্শ পায়। যেন অনেক কিছু শুষে নিচ্ছে সেই হাত। যেমনভাবে বহুদিন এই হাতের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে একটা শীতল ছায়া। তার ইচ্ছে করল সেই ছায়ার মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। তার বুকের সমস্ত ভার নামিয়ে হালকা হয় পাখির মতন। কিন্তু তবু সে মাটি থেকে মুখ তুলতে পারল না। শুধু বুঝতে পারল তার মাথার নীচের মাটি আরও বেশী করে ভিজে যাচ্ছে। মানুষটা তার পাশেই বসল পা ছড়িয়ে। রাতের নিস্তব্ধতা যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠল ওদের দুজনের মধ্যে। সে শুনল যেন অনেক দূর থেকে তারার আলোর মতো মানুষটার গলার স্বর ভেসে আসছে।

'আজ ইউনিয়ানের অপিসে গেছিলাম।'

আবার নিস্তবধতা নেমে আসে। কয়েকটা মুহূর্ত ছুটে গিয়ে হারিয়ে যায়।

'আরও এসেছিল অনেকে। হাল সবারই এক। উপেনের ঘরে তো দু'দিন ধরে উনুনে হাঁড়ি চড়ে নি।'

'কি বলল ইউনিয়নের দাদারা ?'

'এখন তো আর কিছু করার নাই। কল খুলুক। সবাই কাজে যোগ দিক। তারপর সবাইকে একজোট হতে হবে। মালিককে বলতে হবে ভাটি সরানোর জন্য কল বন্ধ থাকলেও যেন আমরা অর্ধেক বেতন পাই।'

'তোমরা বললেই মালিক শুনবে ? মালিকের টাকা বেশী হয়েছে ?'

'কেন দিবে না। আমরা তো কাজ চাই। যদি কাজ না দিতে পারে তবে আমরা কি করব ? আমরা খাব কি ? আর যদি না দেয় তবে অন্য রাস্তা ধরতে হবে। আমরা ধর্মঘট করব।'

'ধর্মঘট !'

চমকে ওঠে মন্দাকিনী। ওর শরীরটা নিজে থেকেই যেন মাটি থেকে ছিটকে সোজা হয়ে যায়। সে চেয়ে থাকে মানুষটার দিকে। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, 'ধর্মঘট যদি অনেকদিন চলে ? টাকা আসবে কোথা থেকে ? খাবে কি ? ছেলেমেয়েদের মুখে কি দিবে ?'

কিন্তু মন্দাকিনী দেখে এই কিছুক্ষণ আগের মানুষটা যেন অন্যরকম হয়ে গেছে এখন। তার কথাগুলো মানুষটার বুকটায় কাঁপন ধরিয়ে দিতে পারল না। ওর চোখের দৃষ্টিতে ও যেন একটা ধ্রুবতারা স্থির হয়ে আছে। ওর মুখে ফুল ফোটার মতো একটুকরো হাসি।

'চলুক না অনেকদিন। এখন তো না খেয়েও বেঁচে আছি। আর তখন পারব না ?'

মন্দাকিনীর ডান হাতটা একটা শক্ত মুঠির মধ্যে ধরা হয়ে থাকে।

'তুমি পারবে না লক্ষ্মীর মা ? যদি তেমন দিন আসে, পারবে না সংসারটা চালিয়ে নিতে ?'

একটা শিশুর মতো মুখ চেয়ে থাকে মন্দাকিনীর দিকে। মন্দাকিনীর বুকের ভেতরটা পর্যন্ত ঝন্‌ঝন্‌ করে কেঁপে ওঠে। রক্তগুলো কি পাগল হয়ে গেছে। ছুটে বেড়াচ্ছে তার সারা শরীর দাপিয়ে। তার মনে হলো এই চল্লিশ ছাড়িয়ে যাওয়া শরীরটা একটা অদ্ভুত আলোয় ঢেকে যাচ্ছে। পাখির গানের মতো একটা সুর রক্তের মধ্যে জেগে উঠছে। প্রায় অভুক্ত থাকা দেহটা জেগে উঠছে সেই পরিচিত কল্লোলে, ছল ছল গানে। তার বুকের ভেতর এখনও বয়ে যাচ্ছে এক প্রিয় নদী। তার চোখের মধ্যে এখনও বড় স্পষ্ট একটা সবুজ দ্বীপের ছবি। তার মনে হচ্ছিল সে এখন সহজেই তার এই দারিদ্র্য, এই 'মিথ্যেবাদিনী' অবপাদ, ঘৃণার দৃষ্টি—এসব সহজেই দু'পায়ে মাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে। তার মনে হলো এখন সে তার প্রিয় মানুষটার হাত ধরে সেই নদীর কাছে পৌঁছে যেতে পারে।

মন্দাকিনী পাগলের মতো তার মানুষটাকে জাপটে ধরল সমগ্র শরীর দিয়ে। নিজের সমস্ত শরীরটাকে মিশিয়ে দিতে চাইলো কালপুরুষের মতো আর একটা শরীরের সাথে। এ শরীর একজন কৃষকের নয়, এ শরীর একজন শ্রমিকের নয়—এ শরীর একজন মানুষের। যে বুকের মধ্যে নদী ধরে রাখে। চোখের মধ্যে ধরে রাখে সবুজ দ্বীপ।

মন্দাকিনী সেই মানুষটার কানের কাছে মুখ এনে ফুল ফোটার মতো করে বলল, 'ঘুমাবে চল। রাত শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই।'